স্বাতী নক্ষত্রের জল

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

- প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৪
- প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
- মুদ্রাকর : নিমাইচন্দ্র ঘোষ। দি রঘুনাথ প্রিণ্টার্স। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬
- প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

'দেশ' পত্রিকা-সম্পাদক
স্বনামধন্য শ্রীসাগরময় ঘোষ
অগ্রজপ্রতিমেষু

মাপ করবেন, আপনি কি ইণ্ডিয়ান ?

চমকে ফিরে তাকালাম। দেশের দক্ষিণতম তটরেখা থেকে হাজার মাইল দূরে, এই নারিকেল-বীথি-ঘেরা দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলাম নীল নিস্তরঙ্গ বিস্তৃত জলরেখার দিকে তাকিয়ে, পরনে একটা ছাই রঙের প্যাণ্ট আর হাওয়াই সার্ট, আমাকে লোকটি 'ইণ্ডিয়ান' বলে চিনলো কী করে ? আমার মুখের রেখায়, আমার দেহের বর্ণে কোথাও কি আর 'ভারতীয়তার ছাপ' আছে ?

দীর্ঘ তিনটি বছব অর্থাৎ ছত্রিশটি মাস,—এর মধ্যে দিন এসেছে রাত গেছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেছে, আমি দেশছাড়া, ঘর-ছাড়া, এবং শুধু তা-ই নয়, দেশ সম্বন্ধে যাতে একটুও দুর্বলতা সঞ্চার না হয়, যাতে কোনো স্মৃতির কোনো কশাঘাতই আমাকে বিপর্যস্ত না কবতে পারে, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। এ অঞ্চলে এসে কাউকে তেমন করে আত্ম-পরিচয়ও দিইনি।

সত্যি কথা বলতে কী, আমার দেশ, আমার ঘর আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। দেশ যেদিন স্বাধীন হলো, সেদিন আমি দেশে, আমার শহরে, আমার ঘরে। সেই উন্মাদনার কথা চিন্তা করে আজও হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি, স্মরণ করতে পারি সেই জন-সমুদ্রেব অবারিত উচ্ছ্বাসের কথা, সেই বিপুল জনতার 'গভর্ণর'-এর প্রাসাদের নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে ঢুকে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়ানো অথচ একটি জিনিসও স্পর্শ না করা, উদ্যানের একটি ফুলের পাপড়িও না ছিঁড়ে ফেলা, কিন্তু তারপর ? তারপর থেকেই শুরু হলো বিপর্যয়। ক্রমশ যত বয়স বাড়তে লাগলো, ততই মোহ কাটতে লাগলো। আমার বাবা চিরকাল খদ্দর পরতেন, চরকা কাটতেন, আগস্ট আন্দোলনে জেলেও গিয়েছিলেন, আর মা পড়াতেন সাধারণ একটা মেয়েদের স্কুলে, আমরা ছিলাম এক কথায় নিম্ন মধ্যবিত্ত।

সংসারে অভাবও ছিল প্রচণ্ড। আমরা ছিলাম পাঁচ ভাইবোন। তিন ভাই দুই বোন। আমি বাবার ছোট ছেলে, কিন্তু শেষতম সন্তান নয়, আমার পরে একটি বোন ছিল—মৈত্রেয়ী। মিতা, মিতু, বলে ডাকাডাকি করতো সবাই।

কিন্তু সে সব কথা থাক। আমি ঘর-পালানো ছেলে, ঘরের কথা অতো বেশি আমার পক্ষে স্মরণে আনাও ঠিক নয়। তবে যেটুকু না বললে আমার 'চমক' এর কারণটা সঠিক বোঝাতে পারবো না, সে-টুকুই এখানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করি! দেশের স্বাধীনতার পর আমার বাবা ক্রমে ক্রমে 'মন্ত্রী' না হলেও বেশ 'হোমরা-চোমরা' একজন হয়ে উঠলেন।

আমার বাবা স্বাধীনতার আগে বাঙালীর 'বাঙালীয়ানা' নিয়ে খবরের কাগজের সাময়িকী-পৃষ্ঠায় প্রচুর প্রবন্ধ লিখতেন, জাতীয়তা-বাদ নিয়ে মাথা ঘামাতেন, সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন চাইতেন। আমরাও সেইভাবে ভাবিত হতাম, সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হতাম।

কিন্তু স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে আমরা উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হতে লাগলাম। বাবা খদ্দর ছাড়লেন না বটে, কিন্তু তাঁর মুখে বিড়ির বদলে মোটা বর্মা চুরুট উঠলো, আর আমার ছোট বোন 'মৈত্রেয়ী' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্কুলে ভর্তি হয়ে উচ্চবিত্ত শ্রেণীসুলভ চিবিয়ে চিবিয়ে একটা বিশেষ ঢংয়ের উচ্চারণে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে লাগলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম হাতিয়ার-স্বরূপ যে এক উচ্চতর শ্রেণী ছিল, যাঁরা ইংরেজীয়ানাকেই নকল করে পার্টিতে পার্টিতে সুসমারোহে চলাফেরা করতেন, তাঁরা প্যাণ্ট-কোট আর নেকটাইয়ের বদলে দিল্লী থেকে এমন এক নতুন পোশাক আমদানী করলেন, চেহারায় তা প্রাক-স্বাধীনতা-যুগের ইংরেজী পোশাকেরই সামিল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীয়ানারই খুব কাছাকাছি একটা জগাখিচুড়ি 'সংস্কৃতি' গড়ে তুললেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তার মধ্যে বেচারা রবীন্দ্রনাথকেও এঁরা রেহাই দিলেন না। বাবার সঙ্গে

দিল্লী গিয়ে একবার এক 'উচ্চশ্রেণী'র পার্টিতে আমি 'মম চিত্তে গীতি নৃত্যে'র সঙ্গে নাভির নিচে কাপড় পরা স্বল্প ও স্বচ্ছবাস জনৈক তরুণীকে ভারতীয় ও ফক্সট্রট্-এর জগাখিচুড়ি এক ধরনের নৃত্য পরিবেশন করতে দেখেছিলাম।

যাই হোক, নিজের কথাই বলি। বাবা আমাকে দেশী স্কুল ছাড়িয়ে ডন বস্‌কোতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। দাদারা সাধারণ স্কুল থেকে একজন গেল প্রেসিডেন্সীতে, আরেকজন সেণ্ট জেভিয়ার্সে। বাবা পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিতেন, বাঙলা সর্বস্তরে প্রচলন করতে হবে, বাংলা ভাষার উন্নতি চাই। প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন, এম-এ ক্লাশ পর্যন্ত সর্বশিক্ষার মাধ্যম চাই বাঙ্‌লা, আর সর্ব সরকারী স্তরে বাঙলা ভাষার প্রবর্তন করা চাই। ঘন ঘন করতালি দ্বারা অভিনন্দিত বাঙলা ভাষার এহেন প্রবক্তা কিন্তু বাড়িতে বলতেন অন্য কথা। বলতেন, ইংরেজী না শিখলে ছেলেমেয়েরা করবে কী?

মা তর্ক করতো। বাবা সহজ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতেন, একটা ছোট গ্রুপ চিরকাল বড়ো গ্রুপের ওপর আধিপত্য করে। সেই ছোট গ্রুপকে যদি status quo বজায় রাখতে হয়, তাহলে নানান ফন্দী-ফিকির অবশ্যই খুঁজতে হবে। সবাই বাঙলা নিয়ে মাতুক, কিন্তু তাঁর ছেলেরা ইংরেজী শিখে বিদেশে ঘুরে আসুক, খুব উঁচু পদে বসানোর সুবিধে হবে, ইত্যাদি।

আমি অসংখ্যর মধ্য থেকে একটি মাত্র উদাহরণই বেছে নিলাম। বাক্‌বিস্তার করে লাভ নেই, শুধু এটুকু বলি, সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষার পর আমি যেদিন অল্প একটু মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম, সেদিন মা আমাকে মারতে বাকি রেখেছিলেন, হয়ত অতো বড়ো ছেলের গায়ে হাতও দিতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় বাবা হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসায় ব্যাপারটা আর অতদূর গড়ালো না।

বাবা ব্যাপারটা চাপা দিয়ে আমাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। কৌতূহলের অন্ত ছিল না, দরজা একটু ফাঁক করে তাঁদের

সেদিনকার 'ডিনার-টেবিল'-এর তর্ক আমি শুনেছিলাম। বাবা বলেছিলেন,—ইয়ংম্যান, একটু-আধটু খাক না। ওকে আমি 'ওয়েস্ট জার্মানি'তে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। সেখান থেকে রীতিমত 'মানুষ' হয়ে ও ফিরে আসবে।

আমি মনে মনে হেসেছিলাম। আমি ছোটবেলা থেকেই একটু ভাবুক প্রকৃতির ছিলাম, কৌতূহলও ছিল অনন্ত। ভারতীয়ত্বের প্রবক্তা আমার বাবা কতদূর মনে মনে 'উচ্চতর শ্রেণী'তে উঠেছেন, এটা পরখ করবার দুর্দান্ত জেদ থেকেই আমি সেদিন মদ্য পান করেছিলাম। মা আমাকে মারতে ওঠায় মনে মনে সেদিন খুশি হয়েছিলাম, আরও খুশি হতাম, বাবা যদি সেদিন আমাকে মারতে মারতে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন।

তা দেন নি, তাই আমি পরীক্ষার ফল বেরুবার আগেই ঘর ছাড়লাম। কাউকে কিছু না বলে বাবার ক্যাশবাক্স ভেঙে সোজা বোম্বাই।

পাছে খবরের কাগজে কোনো বিজ্ঞাপন দেখি, তাই খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়তাম না।

বছর দুয়েক বম্বেতে অবশ্যি আমার খুব কষ্টে কেটেছে। দুটো একটা ছুট্‌কো কাজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটি চাকরি পেয়ে গেলাম।

'চমন লাল-জেঠাভাই অ্যাণ্ড কোম্পানী' বলে একজন সিন্ধী ধনীলোকের ফার্ম। বছর খানেকের মধ্যেই কাজে উন্নতি হলো, আমাকে বিভিন্ন বন্দরে ঘুরে ওঁদের চালানের কাজকর্ম দেখতে হবে। এই সূত্রে জাহাজে অথবা এরোপ্লেনে কখনো যাচ্ছি মোম্বাসা কখনো জাঞ্জিবার, কখনো কলম্বো অথবা ব্যাঙ্গালোর, কখনো এর্নাকুলম, মালদ্বীপ। আবার কখনো দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে এই সিসেলস বা সিচেলাস দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ, 'মাহে'তে, যার প্রধান বন্দরের নাম ভিক্টোরিয়া।

আপনি ইণ্ডিয়ান?

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন। মুখ তুলে তাকালাম। খাঁকি হাফ প্যান্টের ওপরে সাদা হাফ শার্ট, মাথায় সস্তা স্ট্রহ্যাট, হাতে স্টিল-ব্যাণ্ডের ঘড়ি শোভা পাচ্ছে, পায়ে সাদা এক জোড়া মোজা ময়লা হয়ে পুরানো কালো 'সু' জুতোর সঙ্গে লেপ্টে আছে।

মিশকালো দেহের বর্ণ নয়, একটু বাদামী, মাথার চুলগুলো শক্ত শক্ত, কোঁকড়া কোঁকড়া, হ্যাট-টা পেছনে হটানোর ফলে মাথার সুপ্রচুর কেশরাশির সামনেটা দৃশ্যমান। ভদ্রলোকটির নাসারন্ধ্রের কাছটা একটু মোটা, ঠোঁট ছুটি স্থূল।

কলকাতায় থাকলে এঁকে প্রথমেই 'নিগ্রো' বলে মনে করতাম, কিন্তু দীর্ঘ ছত্রিশটা মাস এ-সব অঞ্চলে থাকবার জন্য আরও বেশি কিছু জানতে পেরেছি। আফ্রিকার অধিবাসীরাও সবাই একরকম দেখতে নয়। এঁকে প্রথমে দেখেই মনে হলো ভদ্রলোক সম্ভবত মূল আফ্রিকার, বিশেষ করে পশ্চিম দিকের আফ্রিকার মানুষ, আফ্রিকার সন্নিকটস্থ কোনো দ্বীপের অন্তত কেউ নন!

ভদ্রলোকের মুখের দিক থেকে চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, আমি যে ইণ্ডিয়ান, আপনি এ-কথা বুঝলেন কী ক'রে?

স্মিতহাস্যে ভরে গেল ভদ্রলোকের মুখ, আমি ইণ্ডিয়া ঘুরে এসেছি, তা প্রায় ছ-মাস ছিলাম বম্বাই, দিল্লি, কানপুর, মাদ্রাজ, সব ঘুরেছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি এখন ইণ্ডিয়ান দেখলেই চিনতে পারি।

অল্প একটু হেসে বললাম, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে যে আপনার ভুল হয়নি, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। এবার আপনার পরিচয়টা দিন? আপনি ঠিক এখানকার লোক নন বলেই আমার ধারণা।

ভদ্রলোকের হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো, মাথার স্ট্রহ্যাট-টা নামিয়ে হাতের ওপর আনলেন, বললেন ঠিকই বলেছেন। আমি এইমাত্র এই দ্বীপে, অর্থাৎ এই ভিক্টোরিয়া বন্দরে এসে নামলাম। মাথার মধ্যে এখনো জাহাজের গতিটা কাজ করে চলেছে। জাহাজ থেকে নেমে, সুটকেশটা হোটেলে রেখেই ঘুরতে বেরিয়েছি।

বললাম. তা হলে অনুগ্রহ ক'রে চলুন আমার বাংলোতে, একটু চা-টা খাওয়া যাবে।

ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার একখানা হাত চেপে ধরলেন, বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন।

বললাম, একটু দূরে অবশ্য, সর্ট কাট রাস্তায় গেলে মাইল দেড়েক হবে আর ঘুরে গেলে তিন মাইল। আসুন, একটা গাড়ি খুঁজি।

ভদ্রলোক বললেন, না-না, গাড়ির দরকার কী? মাইল দেড়েক হাঁটা এমন কিছু নয়। কিন্তু গাড়ি? এই সিচেলাস দ্বীপে গাড়ি আছে?

বললাম. তা আছে বই কি। ব্যক্তিগত মালিকানায় যা আছে, তার কথা ছেড়ে দিন, ভাড়ায় খাটাবার মতোই গাড়ি আছে চার-খানা।

বলতে-বলতে আমরা চলা শুরু করেছিলাম। গর্ডন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে চলছিলাম।

দিনটা ছিল রবিবার। তাই পার্কের এক কোণে ব্যাণ্ড বাজছিল। সেই ব্যাণ্ডের কাছে নানান বয়সী শিশু ও বালক-বালিকাদের ভিড়। কালো, আধ-ফরসা সবরকম ছেলেমেয়েই আছে।

আমি সেইদিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই একটু দাঁড়িয়ে গেলাম। ভদ্রলোক সোৎসাহে ইণ্ডিয়ার বর্ণনা করে চলেছেন, আমার তা কানেও যাচ্ছে না!

ব্যাণ্ডের কাছাকাছি একটা গোলাপী গাউন পরে মেরী দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে ফুটফুটে একটি শিশু ধবধবে ফরসা। ঐ শিশুটিকে কখনো ওর সঙ্গে আগে দেখিনি। ইচ্ছে করছিল হাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, সঙ্গে ওটি কে?

কিন্তু কী এক দুর্বোধ্য অভিমান সেই সময় আমার মনটাকে হঠাৎ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, আমি আর ওখানে না দাঁড়িয়ে সঙ্গী ভদ্র-লোকটির সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলে ডানদিকে বেঁকে গেলাম। মেরী আমারই দিকে তাকিয়ে ছিল, মূহূর্তের জন্য মনে হলো আমাকে

অমন করে চলে যেতে দেখে তার মুখখানা নিস্প্রভ হয়ে গেল।

এটা বুঝতে পেরেও আমি দাঁড়ালাম না। অথচ ভেবে দেখতে গেলে এ অভিমানের কোনো অর্থ হয় না। গর্ডন স্কোয়ারে বিকেলে, বিশেষ করে রবিবারের বিকেলে, বহু লোক বেড়াতে আসে। আমিও সময় পেলে যেতাম, অলস দৃষ্টি মেলে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতাম, ব্যাণ্ডে ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত কিংবা গুড বায় টিপাপারির সুর শুনতাম! হঠাৎই আলাপ হয়ে গিয়েছিলে মেরীর সঙ্গে।

মেরী ফ্রিম্যান, খাস বিলেতের মানুষ। বোধহয় সেদিন আর কোথাও বসবার জায়গা না পেয়ে আমি যে-বেঞ্চিতে বসেছিলাম, তার পাশে বসেছিল, সঙ্গে চেন বাঁধা ছোট্ট একটা বেঁটে ডুসাণ্ট জাতীয় কুকুর। ব্যাণ্ডে 'গুড বায় টিপাপারি' বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই মেরী স্থানকাল ভুলে আপন মনে গুন্ গুন্ করে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও স্থানকালপাত্র ভুলে বলে ফেলেছিলাম,—ইয়ু স্পিক ইংলিশ?

সুর থামিয়ে মেরী আমার দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল, গুড্ গ্রেশাস! সো আই মিট এ ম্যান হু স্পিকস ইংলিশ!

এইভাবেই আলাপ হয়েছিল মেরী ফ্রিম্যানের সঙ্গে। তার পর থেকে প্রায়ই দেখা হতো গর্ডন স্কোয়ারে। কখনো আমাকে ওর বাড়িতে যেতে বলেনি বা আমিও বলিনি ওকে আমার বাড়ি আসতে। মেরী ভিক্টোরিয়ায় এসেছে বছরখানেক হয়ে গেল, কিন্তু আর ওর দ্বীপ ভালো লাগছে না।

ওর স্বামী জন ফ্রিম্যান ওর থেকে বয়সে অনেক বড়ো, তার ওপরে তাঁর কাজ নিয়ে ভদ্রলোক এমন ব্যস্ত যে স্ত্রীকে নিয়মিত সঙ্গ দিতে পারেন না। ওর ক্লাব-টাবের জীবন ভালো লাগে না, বিকেলে প্রিয় কুকুরটিকে নিয়ে গর্ডন স্কোয়ারে চলে আসে বেড়াতে।

মেরীর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি বলে মনে হয় না। চোখের বর্ণ প্রায় নীল, বিকেলের সমুদ্রের মতো, মাথার চুল 'হর্স্‌টেল' করে বাঁধা, মিশ কালো নয়, সামান্য একটু লালচে। মুখে একটু লাবণ্য

আছে, একধরনের সরলতা আর ছেলেমানুষী ভাবের একটা সংমিশ্রণ। পাশ্চাত্য ধরনে সুন্দরের পরাকাষ্ঠাকে ধরা হয় যে দেহলতাব গঠন দিয়ে, সেদিক থেকে মেরী আশ্চর্য রকম আকর্ষণীয়া। আঁটসাঁট গাউনের বেষ্টনীতে সে দেহ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে আরও অনবদ্য রেখায়।

দেখতে দেখতে ওর সঙ্গে আমার একটা সখ্যভাব গড়ে উঠলো। কথা হ'লো, অন্যদিন বিকেল পাঁচটায় কিন্তু ববিবার কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় গর্ডন স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

অন্য কিছু নয়, পাশাপাশি দুজনে বসে গল্পই কবতাম। দুজনেব বদলে একজনে, কথাটা ব্যবহাব করলেই ভালো হয়। কারণ, ও-ই ছিল প্রধান বক্তা আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রোতা মাত্র। ওর ভাবনার রেকর্ড যেন আমার কানের কাছে ক্রমাগত বেজে চলতো, আর আমি মন দিয়ে শুনতাম।

ওর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা ছেলেমানুষী ভাব প্রকাশ পেতো, তাতে 'কী বলছে থেকে' কীভাবে বলছে, সেটাই বেশি আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দিতো আমার কাছে। ছোট থেকেই ওব দেশ দেখার অভ্যাস, তাই বুড়ো জনকে ও বিয়ে করলো। জন চাকবি কবতো লণ্ডনেব এক অফিসে, ভালো চাকরী।

মাত্র বাহান্নো বছর বয়স জনিব, এমন কি বুড়ো? কী বলো? কথা বলছো না যে?

আমি উত্তরে শুধু বলতাম, হুঁ।

আমার এই ছোট্ট হুঁ'ই যথেষ্ট। তারপরে ও আবার শুরু করতো।

জন ভীষণ কাজ-পাগলা মানুষ, অথচ বিয়ের পর দুম্ করে চাকরি ছাড়লো, দূর গ্রামে কিছু সম্পত্তি ছিল, সে-সব এক কথায় বিক্রী করে কিছু টাকাকড়ির পুঁজি হাতে করে বউকে নিয়ে চলে এলো সুদূর সিচেলাস দ্বীপে। হাতে ছিল একটা পুরানো ম্যাপ, সেটাকে এখানে এসে বড়ো করে নিজেই আঁকছে আর নিজেই ছিঁড়ছে, আর শেষ পর্যন্ত দিন কয়েক হলো, কয়েকজন মজুর নিয়ে একটা

পাহাড়ের স্তূপ খুঁড়ছে।

কেন ?

মেরী বলতো, ওর ধারণা, সে যুগের জলদস্যুরা ওখানে গুপ্তধন পুঁতে রেখেছে, পুরো পাহাড়টা ও কিনে নিয়েছে, তা জানো ?

বলেছিলাম, আমাব সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিও, কেমন ?

মেবী উত্তরে উদাস ভাবে বলেছিল, আচ্ছা।

কিন্তু তারপরে ওর দিক থেকে আর কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি। আমি আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিনি। তবে, এ-কথাও ঠিক, মেরীর স্বামীকে আমি দেখেছিলাম।

গর্ডন স্কোয়ার থেকে সংক্ষিপ্ত পথে বাড়ি যেতে হলে উঁচু-নিচু পায়ে চলা পথ। তারই এক বাঁকে এসে বাঁদিকে তাকালে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড় লক্ষ্যে পড়ে। যেন বড়ো পাহাড়ের কোলে একটা ভাল্লুক ওৎ পেতে বসে আছে। সেইখানে জনকতক মজুর নিয়ে একজন সাহেব কী সব খোড়াখুঁড়ি করছে।

লম্বা প্যান্টের ওপরে পাতলা পুরো হাতা জামা, বড়ো বড়ো মাথার চুল, সামনের দিকে পাতলা হয়ে টাক পড়েছে, কানের তুপাশের চুলে রীতিমত পাক, কিন্তু পিছনের চুল এসেছে প্রায় ঘাড় পর্যন্ত। মুখে, চিবুকের কাছে ছোট্ট ত্রিকোণ দাড়ি, তাতে লালচে চুলেব মাঝখানে একটি শুভ্র সরলরেখা, আর আছে সরু সূক্ষ্ম গোঁফ। মুখে একটা সরু আকারের পাইপ, হাতে ষ্টীলের এক ধরনের ছড়ি, সেটার মাথার দিকে বসবার ব্যবস্থা আছে।

ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে সে যুগের কোনো পর্তুগীজ দস্যু বলে ভ্রম হয়। মাথার ওপর সে-ধরনের টুপি আর হাতে তলোয়ার থাকলেই ছায়াছবিতে দেখা পর্তুগীজ জলদস্যুর সঙ্গে চেহারা একেবারে হুবহু মিলে যেতো। আমাকে সেদিন ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে সব-কিছু লক্ষ্য করতে দেখে জন ক্রিম্যান ছোট্ট ক'রে 'হ্যালো' বলে ডেকেছিল, কিন্তু তারপরেই মত্ত হয়ে গিয়েছিল কাজে।

মেরীকে পরদিন ওঁর কথা বলেছিলাম, যতদূর মনে হলো, উনি মিস্টাব ফ্রিম্যানই হবেন।

মেবী সংক্ষেপে বলেছিল, হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছো। ও ছাড়া আবার কে?

সেদিন কিন্তু রবিবার বলে আমি কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় এসে-ছিলাম। কিন্তু মেরীর দেখা নেই। সাড়ে চাবটে থেকে পৌনে পাঁচটা, আমি অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে গেছি, এমন সময় ওই অপরিচিত নিগ্রো ভদ্রলোক আমায় ডাকলেন, 'মাপ করবেন, আপনি কি ইণ্ডিয়ান?

প্রথমে চমকে উঠেছিলাম, তার পরে আলাপ একটু এগিয়ে যেতে সম্ভবত মেরীর ওপর তীব্র অভিমানের প্রতিক্রিয়াতেই ভদ্রলোককে একেবারে চায়ে আমন্ত্রণ ক'রে বসলাম।

মেরীকে চকিতের জন্য দেখতে পেলাম তার পরক্ষণেই, কিন্তু তখন আমাব মধ্যে একটা 'জিদ' জেগে উঠেছে, আমি ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোককে নিয়ে চলতে লাগলাম বাড়ির দিকে।

উঁচু-নিচু পথটা ধরে যেতে যেতে বাঁকের কাছে আসামাত্র এক মুহূর্তের জন্য অদূরের সেই ভাল্লুক পাহাড়টার দিকে তাকালাম। চারদিকে খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন, কিন্তু মজুররাও নেই, জন ফ্রিম্যানও নেই, হয়ত দিনের কাজ শেষ করে দিনশেষে যে-যার বাড়ির দিকে চলে গেছে।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, আপনার নামটা কী, মিস্টার?

বললাম, সান্যাল। 'সানিয়েল' বলে ডাকতে পারেন।

'এটাও আমার বানানো নাম। এই নামে আমি সেই বম্বে থেকেই চলাফেরা শুরু করেছি।'

ভেরি গুড, মিস্টার সানিয়েল ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম টমাস গ্যাব্রিয়েল টমাস। আমি খ্রীস্টান। আপনি নিশ্চয়ই 'ইন্দু'?

'ইন্দু' নয় 'হিন্দু'। বললাম, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

আর কতদূরে আপনার বাড়ি ?

বললাম, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তো ?

টমাস হাসলেন। ওঁর দাঁত খুব ঝকঝকে। হাসলে দাঁতের সারি রীতিমত দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। বললেন না স্যর, তা নয়, আমি এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

বললাম বেশিদূর নয়, আর একটু।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটু উঁচুতে উঠেছিলাম। এখান থেকে বাঁ দিকে বেঁকে একটু উৎরাই-পথে নামতে হবে। কিন্তু সে জায়গায় এসে টমাস দাঁড়িয়ে পড়লেন, চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, বাঃ !

আসন্ন সন্ধ্যাকাল। আমাদের দেশে যাকে 'গোধূলিলগ্ন' বলে, এ সেই লগ্ন। দেশে গোধূলিকাল যতো অল্পক্ষণের জন্য বিস্তৃত, এখানে তা নয়, এখানে গোধূলির আভা থাকে অনেকক্ষণ। সূর্য সমুদ্রের বুকে বিলীন হবার আগে এখানে যেন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থমকে থেমে থাকেন, যেন মুখ ফিরিয়ে শেষবারের মতো ধরিত্রীর বিষণ্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে চান। সেই স্তিমিত হরিদ্রাভ আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এসে পড়েছে সামনের বিস্তৃত উপহ্রদটির ওপরে।

আমাদের ঠিক নিচেই বিস্তৃত উপহ্রদটি তার নিস্তরঙ্গ গভীর নীলজল নিয়ে বাঁদিকে ধনুকের মতো বেঁকে আছে, অপর প্রান্তে নারিকেল-বীথির আড়ালে আমার সাদা বাঙলো বাড়িটা ছোট্ট এক শ্বেত কপোতের মতো দৃশ্যমান।

বাঁদিক ছেড়ে সামনে এবং ডানদিকে তাকালে কিন্তু অন্য এক দৃশ্য চোখে পড়ে। উপহ্রদটির অপর পাড়ে সোনালী বালুরেখা, সারি সারি নারিকেল আর মাঝে মাঝে বটগাছ-সদৃশ মহীরুহ যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে, 'টাকামাকা' গাছ। সামনে অথাৎ উপহ্রদটির পরপারে কোনো বাড়ি নেই, বালিয়াড়ি আর গাছপালা, আর ডানদিকে তাকালে দেখা যায় উধাও সমুদ্র-ঘেঁষে একটি বালুরেখা চ'লে এসেছে

হ্রদের অনেকখানি। তাতেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কয়েকটি নারিকেল গাছ।

আবার অনুরূপভাবে, যে উঁচু প্রস্তর ভূমিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার ঠিক ডানদিক থেকে স্থলভাগ এগিয়ে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত, এখানেও প্রায় ধনুকাকৃতি, তবে আমাদের ঐ বাঁদিককার অংশের মতো সুগঠিত নয়, আমাদের ধনুকটা ছিলা পরানো, এদিকটা ছিলাবিহীন।

কিন্তু এদিকের স্থলভাগ এগিয়ে গিয়ে যেখানে সমুদ্র ছুঁয়েছে, সেখান থেকেও একটা নারিকেল সমন্বিত বালুময় সূক্ষ্মরেখা এগিয়ে গেছে পরপারের সূক্ষ্ম-রেখার দিকে ; কিছুদূর গিয়ে বুঝি আর মিলতে পারেনি, দু'জনেই থমকে গেছে পরস্পরের মুখোমুখি। যেখানে তারা মিলতে পারেনি, সেখানেই হচ্ছে সমুদ্রের সঙ্গে উপহ্রদটির সংযোগ স্থল।

ঐ সংযোগ স্থলের নিচে কোনো ডুবো পাহাড় থাকা সম্ভব, কারণ ঐ জায়গাটুকুতে তিন থাক্ সিঁড়ির মতো তিনটি সুশুভ্র রেখা, মহাদেবের ললাটের ত্রিপুণ্ড্রকের মতো তিনটি রেখায় সমুদ্রের ঢেউ ওখানে ভেঙে গিয়ে রেখার সৃষ্টি করেছে। এত দূর থেকে ঢেউ ভাঙার শব্দ শোনা যায় না, শুধু দেখা যায়, সমুদ্রের ঢেউ ওখানে ক্রমাগত উদ্বেল হয়ে ভেঙে পড়ছে।

সেই আসন্ন সন্ধ্যার মুহূর্তে, চারদিকে যখন ঈষৎ রক্তিম হরিদ্রাভ রেখা বিচ্ছুরিত হয়ে আছে, তখন সমুদ্রসংলগ্ন নিস্তরঙ্গ হ্রদটি ঘোর নীল হয়ে হয়ে বেগুনি রঙে পর্যবসিত হচ্ছে। পশ্চিম দিগন্তের আরক্তিম আভা, গোধূলির হরিদ্রাভ বর্ণচ্ছটা, জলরাশির বেগুনি রঙ তার ওপরে ঐ তিনটি দুগ্ধ ধবল রেখার সমাবেশ, এ দেখে বিস্ময়ে হতবাক কে না হবে ?

টমাস বললেন, চমৎকার জায়গা !

বললাম, হ্যাঁ। এই আকর্ষণেই আমি মূল শহর ছেড়ে এই গ্রামীণ জায়গায় বাংলো ভাড়া নিয়ে বাস করছি।

টমাস বললে, ইণ্ডিয়ার লোক কিনা, তাই

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, ইণ্ডিয়ার লোক আর বলবেন না,- এখন এই দ্বীপেরই বাসিন্দা হয়ে গেছি। নিন, আসুন।

আমরা আবার চলতে লাগলাম। চলতে চলতে যখন বাড়ি এসে পৌঁছলাম, তখন ঝপ করে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দেশের মতো গোধূলি মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামে না, এখানে গোধূলির আলো থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় ঝপ করে সন্ধ্যা নেমে আসে। রঙ্গমঞ্চের কোনো আলোকিত দৃশ্যের ওপর হঠাৎই যেন কৃষ্ণ-যবনিকাখানি টেনে দেওয়া।

আমি যে অঞ্চলে থাকি, সেখানে বিদ্যুৎ এসে পৌঁছয়নি। ভিতরে তেলের আলোই জ্বালাতে হয়। লণ্ঠনগুলো আমাদের দেশের মতো নয়, চৌকো-চৌকো ধরনের।

আমি সামনের গেট্ ঠেলে বাংলো-বাড়ির বারান্দায় উঠতেই দেখতে পেলাম, বড়ো ঘোরানো বারান্দাটার এক কোণে, যেখানে আমার বেতের চেয়ার-টেয়ার শোভা পায়, সেখানে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। সাধারণত কেউ বসলে-টসলেই ওখানে আলো দেওয়া হয়, কিন্তু আলোর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, কেউ ওখানে বসে নেই। মনে মনে একটু আশ্চর্যই হলাম।

আমার একজন 'কুক্' বা রান্না করার লোক আছে, তার নাম—মুবু। আর একটি ঝিও আছে, তার নাম লয়া। দুজনেই খুব নিয়মমাফিক চলে, এ-রকম হবার ত কথা নয়। টমাসকে নিয়ে ওখানে বসলাম। তারপর হাঁক দিলাম, মুবু?

সাড়া পেলাম না। আবার ডাকতেই লয়া বেরিয়ে এলে। বয়সে তরুণী, কিন্তু স্বভাবে একটা জড়সড় ভাব আছে, সাধারণ একটা সেমিজ পরনে, ধবধবে সাদা। গাউনের বদলে সেমিজ বলছি এই জন্য যে, পোশাকটা একটু ঢিলঢিলে, হাঁটুর ঠিক নিচ পর্যন্ত পোশাকটার ঝুল, হাত কাটা, বুকের কাছটা লেস্-বোনা। এই দ্বীপের সাধারণ শ্রমজীবী ক্রিয়োল অথবা নিগ্রো মেয়েরা যে রকম পোশাক

পরে, ঠিক সেই রকম।

তবে এর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, খুব নম্র বিনীত একটা ভাব আছে, আর কথা বলে এমন আস্তে আস্তে যে, ভালো করে কান না পাতলে শোনা যায় না। আর তাছাড়া, কথাও বলে খুব কম। আমি এখানে আসবার পর মুবুই ছিল আমার একাধারে সব, কিন্তু মাত্র দিন দশেক হলো, ও একা আর পেরে উঠছে না বলে লয়াকে নিয়ে এসেছে।

লয়া মুখ নিচু করে অদূরে দাঁড়ালো, তারপর তার অভ্যস্ত মৃদু-গলায় বললে, মুবু নেই।

একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠলাম, কোথায় গেছে?

লয়া মুখ না তুলে সেইভাবেই বললে, সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।

'সাহেব' বলতে ওরা বুড়ো 'কাওয়াসজী'কে বোঝায়। 'কাওয়াসজী' ভারতীয় পার্শী, এখানে ওখানে অনেক ব্যবসা, এই দ্বীপে এসেছেন বহু বছর। দেশে আর ফিরে যাননি, এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

আমার বাংলোয় আসবার পথে তাঁর বাংলোটা পড়ে। বিরাট বাংলো, সামনে পিছনে বিশাল বাগান। বলা বাহুল্য, আমার বাংলোটাও তাঁর, আমি তাঁর কাছ থেকেই ভাড়া নিয়েছি। মুবু আগে তাঁর কাছেই কাজ করতো। আমার সুবিধা হবে বলে মুবুকে তিনি দিয়েছিলেন আমার কাছে।

বললাম, ও। আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো। ভালো করে চা-টা বানাও দেখি? পারবে ত?

মাথা হেলিয়ে জানালো, হ্যাঁ, তা সে পারবে। আর তার পরেই ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

পিছন থেকে ডাকলাম, শোনো?

লয়া দাঁড়িয়ে পড়লো। বললাম, এখানে আলোটা রেখেছো কেন? কেউ এসেছিল?

লয়া মৃদু কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ।

কে?

লয়া মুখ নত রেখেই তার অভ্যাস মতো ধীর স্তিমিত কণ্ঠে বললো, এক মেম সাহেব।

মনে মনে চম্‌কে উঠলাম। ও বললে, গাড়ি করে এসেছিলেন। দূর থেকে আপনাদের আসতে দেখে চলে গেলেন।

নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন?

না।

ড্রাইভার ছিল?

হ্যাঁ।

বললাম, তোমাকে কিছু বলে গেছে?

লয়া বললো, ঐখানে একটা চিঠি রেখে গেছেন।

বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল। টেবিলের দিকে ভালো করে তাকালাম। আলোর কাছেই একটা কাগজ পড়ে রয়েছে পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া। সেটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম। মুখ ফিরিয়ে টমাসকে বললাম, এক্সকিউজ মি মিস্টার টমাস।

দ্যাটস্ অল রাইট। প্লিজ গো অন উইথ ইট স্যার।

একটু বিস্মিতই হলাম। আমি ভাঙা ভাঙা ক্রিয়োল ভাষায় কথা বলছিলাম লয়ার সঙ্গে। সিচেলাস দ্বীপের সাধারণ মানুষরা ক্রিয়োলই বলে। ফরাসী ও ইংরেজীর এক সংমিশ্রণ, আর সঙ্গে কিছু স্থানীয় শব্দও মিশে গেছে, নবাগত টমাসের পক্ষে এ ভাষা বোঝা কি সম্ভব?

বললাম, আপনি আমাদের কথাবার্তা বুঝতে পেরেছেন?

তিনি হেসে বললেন, একটু একটু। আপনি চিঠিটা পড়ুন স্যার, হয়ত খুব দরকারী।

লয়া ততক্ষণে চলে গেছে। আমি কাগজটা চোখের কাছে তুলে ধরলাম। কোনো সম্বোধন নেই, চিঠির শেষে কোনো স্বাক্ষরও নেই। ক্ষিপ্র হাতে কয়েকটি ছত্র লেখা শুধু। বুঝতে কষ্ট হয় না কে

লিখেছে এই চিঠি। চিঠি লিখছে মেরী। লিখেছে ঃ আমার পার্কে আসতে আজ একটু দেরি হয়েছিল, তাই বলে তুমি অমন করে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে ? আর বেশি দিন এই দ্বীপে আমি নেই হয়ত শীগগিরই দেশে ফিরে যাবো। অনেক কথা ছিল, বলা হলো না।

চিঠিটা ভাঁজ করে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখলাম। টমাস আমার মুখেব দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু নবাগতর পক্ষে কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে অবতরণ করা অশোভন বলেই বোধহয় চুপ করে রইলেন।

আমার মনের মধ্যে মেরীর চিঠি যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি এমন নয়। কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গের ওপর মনে মনে আপাতত যবনিকা টেনে দিয়ে টমাসের দিকে স্মিতমুখে তাকালাম, বললাম, তারপরে মিস্টার টমাস, আপনার সব কথা শুনি, বলুন। কোথায় উঠেছেন আপনি ?

টমাস বললেন, হোটেলে। চায়নাম্যান-স্টোর্স টা দেখেছেন নিশ্চয়, তার ওপরে—

বললাম, জানি। রয়্যাল হোটেল।

টমাস বললেন, একটা ছোট্ট ঘর নিয়েছি।

বললাম, মিঃ টমাস, আপনি আমার কাছে চলে আসতে পারেন।

তিনি হাসলেন, তারপরে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা একটু স্পর্শ করে বললেন, মেনি থ্যাংকস! আপনি ফ্যামিলিম্যান, আপনার কাছে এসে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না! আই থিঙ্ক আই অ্যাম অলরাইট দেয়ার।

আমি 'ফ্যামিলিম্যান' শব্দটা শুনে ওর মুখের দিকে একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়েছিলাম, বললাম, আমি ফ্যামিলিম্যান আপনি বুঝলেন কী করে ? আমি তো বিয়েই করিনি।

টমাস অবাক হয়ে গেলেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, কিন্তু,

হ্যাট লেডি—

এইবার ব্যাপারটা বুঝলাম। বুঝে হো-হো করে হেসে উঠলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আর কিছু বলা হলো না, লয়া চায়ের ট্রে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তেমনি মুখ নিচু করা, তেমনি শান্ত, নম্র ভাব।

টমাস একটু অবাক-অবাক চোখেই লয়ার দিকে তাকালেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে নিলেন। লয়া চা, প্যাসট্রি, কেকের টুকরো, সব নামিয়ে দিলো টেবিলের ওপর। আমি টমাসকে বললাম, নিন, চা খান।

বলে, হাত বাড়িয়ে কেট্‌লিটা তুলে খালি কাপে চা ঢালতে লাগলাম। লয়া বুঝলো চায়ে চিনি মেশাবার জন্য তাকে আর দরকার নেই। সে একটু পিছিয়ে গিয়ে তারপরে তেমনি নত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতেই ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি টমাসের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললাম, ও হচ্ছে লয়া। আমার মেড সারভেণ্ট। আমি ছাড়া আর দুটি মানুষ থাকে আমার বাসায়, লয়া আর মুবু। মুবু হচ্ছে 'কুক'। অনেক ঘর আছে, আপনি আসতে পারেন, কোনো অসুবিধে হবে না।

টমাস আবার বললেন, থ্যাঙ্কস। কিন্তু ভেরি সরি, আমার আসা হবে না।

বলতে বলতে টমাসের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, মিস্টার সানিয়েল, এমন একটা কাজ আমি হাতে নিয়ে এসেছি যা করার জন্য একটু নিভৃতির প্রয়োজন। প্রফেশন্যালি আমি একজন হিস্টোরিয়ান বলতে পারেন।

আমি ওর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে টমাস একটু ঝুঁকে নিচু গলায় বললেন, আই হ্যাভ সাম মিশন। আমি কিং প্রেম্‌পকে খুঁজতে এসেছি।

অবাক হচ্ছিলাম উত্তরোত্তর, বললাম, কিং প্রেম্‌পে! সে আবার কে?

টমাস বললেন, সে কী! প্রেম্পের নাম শোনোনি?

না!

টমাসের মুখখানা একটু ম্লান দেখলো। বললেন, এক্সকিউজ মি। আপনি শিক্ষিত মানুষ, ইণ্ডিয়ান, আপনার কাছ থেকে এটা শুনবো, ঠিক আশা করতে পারিনি।

বললাম, কিন্তু আমি হিস্টোরিয়ান নই। আমার সিনিয়ার কেম্বিজ কোর্সে অবশ্য হিস্ট্রি ছিল—

উনি তাড়াতাড়ি বললেন, তবে? আপনারা ইংল্যাণ্ডের টিউডর বংশের খুঁটিনাটির খবর রাখেন, কিন্তু আফ্রিকার খবর রাখেন না, এইটাই দুঃখ।

অল্প একটু হেসে বললাম, আমার দোষ কবুল করছি।

টমাস বললেন, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রেম্পেকে এই দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।

কেন?

টমাস গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেম, আফ্রিকার গোল্ড কোস্টের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? গত বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ গোল্ড কোস্ট স্বাধীন হয়েছে, নাম হয়েছে, 'ঘানা'!

বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ ঘানার কথা শুনেছি বটে। ডঃ নক্রুমা—

হ্যাঁ, ঘানার তিনি প্রধানমন্ত্রী।

টমাস এখানে একটু চুপ করলেন। তারপরে আমাকে উৎসুক দেখে আবার বলতে শুরু করলেন: ঘানার একটা অঞ্চলের মাম কুমাশী। এই কুমাশীতে এক 'আশান্তি' বলে সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায় তাদের রাজাকে বলে 'কোয়াকু'। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বরে 'কোয়াকু'র সিংহাসন নিয়ে কলহের সূত্রপাত হয়। সে সব কাহিনী যদি শুনতে চান, ত, আরেক দিন বলবো। সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন একদিকে 'প্রেম্পে' আর অন্যদিকে আট্‌চেরী বোয়াণ্ডা। ভয়াবহ যুদ্ধ বিগ্রহ হতে থাকে এই নিয়ে। অসংখ্য লোক মারা যায়। ইংরেজ সেনাপতি স্যর ফ্যান্সিস স্কট গিয়ে প্রেম্‌পকে বন্দী

করে বোয়াণ্ডাকে গদী দেন। প্রেম্‌পেকে রাজবন্দী করে নির্বাসিত করা হয় এই দ্বীপে।

টমাস চুপ করলেন। বললাম, রাজা মানুষ প্রেম্‌পে, তাকে খুঁজে পেতে আপনার অসুবিধে হবে না।

টমাস আমার কথা শুনে উচ্চকিত হেসে উঠলেন, বললেন,—আমি 'প্রেম্‌পেকে' খুঁজে বেড়াচ্ছি, এর মানে রাজা প্রেম্‌পের শরীরটাকে নয়, তাঁর এখানে থাকাকালীন কয়েকটা বছরের ঘনিষ্ঠ ইতিহাসের উপাদান জোগাড় করাই আমার উদ্দেশ্য। রাজা প্রেম্‌পে ১৯২৪ সালে 'কায়রো' জাহাজে করে বোম্বাই হয়ে ইংলণ্ডে যান, সেখান থেকে দেশে ফিরে আবাব বাজা হন তাঁর সম্প্রদায়দের। বুঝতেই পারছেন, তাঁর এখানকার আবাসকালীন স্মৃতিচিত্রই আমার রচনা কবার উদ্দেশ্য। এ কাজ মস্ত ভিক্টোরিয়াতে বসে কবাই সুবিধেজনক কারণ তাঁকে রাখা হয়েছিল ভিক্টোরিয়াতেই।

সত্যি কথা বলতে কী, এতো সব ঐতিহাসিক খুঁটিনাটিতে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু টমাসের কথা বলার ধরণ আর অদ্ভুত আন্তরিকতার উত্তাপ আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করলো।

প্রথম আলাপে যতটা লঘু চিত্তের মানুষ বলে ওঁকে মনে হয়েছিল, টমাস আসলে বোধহয় সে ধরণেরই নন। বলতে বলতে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রেমপের কথা বলতে বলতে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন টমাস। কে প্রেম্‌পে, কোথায় কুমাশী আর আশান্তি, এসব আমি কিছুতেই জানতাম না। কিন্তু ওঁর বলার গুণে আমিও আগ্রহী হয়ে উঠলাম প্রেম্‌পে সম্পর্কে।

ওঁর হাতখানা ধরে বলে উঠলাম, মিস্টার টমাস, প্রেম্‌পে সম্বন্ধে যখন যা জানবেন আমাকে জানাবেন, কেমন?

নিশ্চয়ই জানবো, টমাস বললেন, আফটার অল উই আর এশিয়ান্‌স্‌। আফ্রিকাও যে এশিয়ার মধ্যে, সংস্কৃতি ও মানসিক গঠনের দিক থেকে এশিয়ার সঙ্গেই আমাদের সাদৃশ্য যে বেশি, একথা মানবেন ত?

হ্যাঁ, তা অবশ্য।

টমাস বললেন, আপনার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ মিঃ সানিয়েল, আমি আজ উঠি, রীতিমত অন্ধকার হয়ে গেছে।

ডানদিকে ফিরে তাকালাম। নারিকেল বীথির মধ্য দিয়ে উপহ্রদটি দেখা যায়, একটা অতিকায় শ্লেটের মতো পড়ে আছে। চাঁদ ওঠেনি, তারাদের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। যেন আকাশটাকেই উল্টে রেখেছে ওখানে কেউ। টমাস সেইদিকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, 'উঠবো' বলেও উঠতে পারলেন না।

বললাম, মিস্টার টমাস, হঠাৎই আপনার সঙ্গে আলাপ। একেও ভবিতব্য বলতে হবে। আমি ভাগ্যবান।

না না, সে কি কথা, ভাগ্যবান আমি, টমাস বললেন, আপনার মতো এতো সজ্জন সহৃদয় অতিথি পরায়ণ ব্যক্তি —

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, একটু ভালো করে মিশে দেখবেন, আমি অসামাজিক, অফিসের পর আর শহরে থাকি না, এখানে ছুটে এসে এই নির্জনতায় ডুব দেই। খুব ভালো লাগে। কিন্তু মিস্টার টমাস, আপনার পরিচয়টা ভালো করে দেন নি। আপনি কি নিজে আশান্তি সম্প্রদায়ের লোক?

না, টমাস বললেন, আমি নতুন ঘানার নতুন মানুষ। বাবা কিছু টাকাকড়ি করেছিলেন, আমি তার সাহায্যে একটু ঘোরাঘুরি করে বেড়াই, আর শুনলেনই ত আমার পেশার কথা।

চমৎকার পেশা, বললাম, যদি অপরাধ না নেন ত জিজ্ঞাসা করি, লেখাপড়া শিখেছেন কোথায়?

বললেন, আক্রাতেই। তারপরে ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়েই থিসিস সাবমিট করেছিলাম।

আমার বিস্ময়ের সঙ্গে সম্ভ্রম যুক্ত হলো, বললাম, তাহলে আমি জনৈক ডক্টরেট-এর সঙ্গে কথা বলছি নিশ্চয়ই।

টমাস বিনীতভাবে বললেন, একটা কিছু তকমা ত চাই, তাই ওটা নিতে হয়েছে। আসলে মনের মতো পড়াশুনো এখনো ঠিক করে উঠতে পারছি না। দেখি, যদি এখনকার মিশনে সাফল্যলাভ

করি !

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর টমাস। উঠে দাঁড়ালাম আমিও, বললাম, অন্ধকারে একা যেতে কষ্ট হবে। চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি।

টমাস বাধা দিয়ে বললেন, না না, আপনি বসুন, বিশ্রাম করুন। আমি ঘানার লোক, গ্রামাঞ্চলেরই ছেলে, অন্ধকারে আমাদের চোখ জ্বলে। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। গুড নাইট।

বললাম, অন্তত একটা টর্চ নিয়ে যান।

টমাস ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, তা বরং দিতে পারেন।

চেঁচিয়ে ডাকলাম, লয়া লয়া ?

লয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় এলো। বললাম, টর্চটা নিয়ে এসো ত ?

লয়া মৃদু গলায় বললে, নেই।

নেই, মানে !

মুবু নিয়ে গেছে।

বাড়িতে টর্চ ছিল একটি, এবং সেটি আমারই টর্চ। সেটা মুবু নিয়ে গেল আমার বিনা অনুমতিতে, এ বড়ো আশ্চর্যের কথা। মুবুকে যতদূর জানি, এ ধরনের মানুষই নয়।

আমার বিব্রতভাব দেখে ডক্টর বললেন, কিছু ভাববেন না, আমি ঠিক যেতে পারবো। সত্যি ভারী সুন্দর জায়গা এটা !

আমি ওঁকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে দেখি, লয়া তখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটু রাগত গলায় বললাম, আসুক আজ মুবু। ও আমাকে ভেবেছে কী ? হঠাৎ ওর টর্চই বা দরকার পড়লো কেন ? আগে আগে এর থেকেও ঘন অন্ধকারে ও যাতায়াত করেছে।

ভয়ার্ত চোখ দুটো আমার দিকে তুলে লয়া আবার নামিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে। অপরাধীর মতো স্তিমিত গলায় বললো, আমারই দোষ। আমিই ওকে দিয়েছিলাম।

কেন ?

অন্ধকারে, যাবে তাই।

এই নবাগতাটির দিকে ভালো করে কখনো তাকাইনি। আমার দরকারে অদরকারে সবসময় সামনে এসে দাঁড়ায় মুবু। এই মেয়েটা যে তখন বাড়ির ভিতরে কোথায় লুকিয়ে থাকে, তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। আজ ঘটনাচক্রে মুবু বাইরে যাওয়ায় লয়া আমার সামনে এসেছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে।

আমি সোজা আমার বসবার ঘরে এসে বসলাম। এ অঞ্চলে শীত কম, গ্রীষ্মও কম, তার ওপরে 'লেগুন' বা উপহ্রদটি থেকে হাওয়া আসতো অনুক্ষণ। কোন রকম পাখা-টাখার দরকার হতো না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি সোফার ওপর গা এলিয়ে। মনের একদিকে ডক্টর টমাস আর অন্যদিকে মেরী। বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ এক সময় মনে হলো, আমার পিছনে, দরজার কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু চম্‌কেই উঠলাম বোধহয়। বললাম, কে ?

মৃদুকণ্ঠে উত্তর এলো, আমি।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম : লয়া। ঘরে, সামনের টিপয়ে একটা সেজ-বাতি জ্বলছিল।

এই ঘরটা আমার বসবার ঘর আর পড়ার ঘরও বটে। বই-পড়ার ব্যাপারেও আমার একটা বেপরোয়া ভাব আছে। যখন যেদিকে ঝোঁক হয়, তখন সেই বিষয় নিয়ে পড়ি। আগাথা ক্রিষ্টি পড়ছি ত, আগাথা ক্রিষ্টিই পড়ছি, ঘর ভরে যায় আগাথা ক্রিষ্টিতে। তারপরে হঠাৎ হয়ত ধরলাম বায়োলজি। এই ধরনের পড়ার কোনো মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই, তবু পড়ি। পড়ার একটা অভ্যেস বরাবরই রয়েছে।

বললাম, কী ?

বললে, মুবু এখনো আসছে না।

তার আমি কী করবো ?

কথাটা ধমকের মাতা শোনালো। ও একটুক্ষণ চুপ করে রইলো।

বললাম, তুই কোথায় থাকিস?

বেল-অম্বি্রতে।

বেল-অম্বি্র! সেটা আবার কোথায়?

লয়া তেমনি মৃদু গলায় বললে, ঐ যে পাগলা সাহেবটা পাহাড় কাটায়, তার নিচের বস্তিতে।

ওর গলার স্বর মৃদু, এবং নরম। একটা মিষ্টতাও আছে। ভালো করে তাকালাম। সাদা সেমিজ। মাথায় একটু চুল আছে, সেটা খোঁপা বাঁধা। জিজ্ঞাসা করলাম, তুই জাতে কী?

খ্রীস্টান!

সে ত জানি, জাত কী? ক্রিয়োল, না, নিগ্রো?

ভীরু কপোতীর মতো দুটি চোখ মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তুলে আবার নামলো, বললে, নিগ্রো।

কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যায় না। গায়ের রঙ স্থানীয় ক্রিয়োলদের মতো ফর্সা বা তামাটে না হলেও ঘোর কালো নয়, বরং আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েদের মতো শ্যামবর্ণ। মাথায় খোঁপা দেখে মনে হয়, চুল খাটো করে ছাঁটা নয়, আমাদের দেশের মেয়েদের মতোই লম্বা চুল, নাসিকা ও অধরোষ্ঠে কিছু স্থূলতা থাকলেও মেয়েটিকে সুশ্রী বলা যেতে পারে। দেখে যতদূর মনে হয়, আমাদের দেশের মতোই কোমলাঙ্গী। সাদা সেমিজের বদলে শাড়ি পরালে বাঙালীদের মধ্যে দিব্যি মিশ খেয়ে যেতে পারে।

আমাকে অমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লক্ষ্য করে মেয়েটা বোধহয় লজ্জা পেলো, মাথাটা আরও নিচু করলো। এমন অবস্থা, যেন সামনে থেকে যেতেও পারছে না, থাকতেও পারছে না।

বললাম, কিছু বলবি?

বললো, খাবার দেবো?

বললাম, তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে, দে। আমি বাথরুম থেকে আসছি।

লয়া ত্বরিত পায়ে দরজা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। সাবান, তোয়ালে-টোয়ালে সজ্জিত আছে, বাথ্‌টবেও জল আছে। আমি স্নানের ব্যবস্থা করতে লাগলাম।

ওরা জানে, স্নানের ঘরে আমার একটু দেরিই হয়। বেশ করে সাবান মেখে গাত্রমার্জনা করাই আমার নিয়ম।

কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে থেকে মুবুর গলা পেলাম। মুবু স্থানীয় লোক, নিগ্রো বলতে যে বন্য চেহারাটা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, মুবুর চেহারা সে ধরনের নয়। গায়ের রঙ লয়ার মতো অতো উজ্জ্বল ধরনের শ্যামবর্ণ না হলেও একেবারে নিকষ কালো হয়। নাসিকার ডগায় আর ঠোঁটে ঈষৎ স্থূলতা, এই পর্যন্ত। মাঝারি কিন্তু বলিষ্ঠ চেহারা, মাথার চুল খুব ছোট নয়, তবে শক্ত, এবং ঈষৎ কোঁকড়ানো। চুল দেখে খানিকটা নিগ্রো নিগ্রো মনে হয়, নইলে ওকে 'ক্রিয়োল' বলে অনায়াসে চালানো যায়।

প্রথম দিন কিন্তু নিজের পরিচয় দিয়েছিল নিগ্রো বলে। লোকটি সাদাসিদে, সরল প্রকৃতির। শুধু একমাত্র দোষ, বড্ড চেঁচিয়ে কথা বলে। কিন্তু তাতে আমি বিরক্ত হই না, কারণ মুবুর কথা বলার মস্ত গুণ, সে যা বলে, অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে বলে। অতি সামান্য ঘটনাও তার বর্ণনার গুণে অসামান্য হয়ে উঠে। এ ছাড়া কাজকর্মের দিক থেকে তাকে কিছু বলার নেই, তাকে শুধু একটু বেশি বকবক করতে দিলে তার মতো সজ্জন, তার মতো বন্ধু আর নেই।

আমি মুবুর কথা ভাবতে ভাবতে স্নান শেষ করে বার হলাম। দেখি. খাবার-টাবার সাজিয়ে মুবু রেডি।

আমাকে দেখেই বলে উঠলো, প্রিন্স, আমার দোষ নেই, টর্চ আমি মোটেই সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই নি।

এখানে বলা দরকার, ওরা আমাকে আখ্যা দিয়েছে 'প্রিন্স'। এর কারণ মুবুকে জিজ্ঞাসা করেছি, মুবু সদুত্তর দিতে পারেনি, মুখ নিচু করে অপ্রতিভের মতো একটু হেসেছে মাত্র। ওদের দেখাদেখি,

কাওয়াসজী পর্যন্ত আমাকে 'প্রিন্স' বলে ডাকতে শুরু করেছেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মুখে এ-সম্বোধন কেন?

ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, নামটা পছন্দ হচ্ছে না?

সত্যি সত্যি ত আর প্রিন্স নই।

মনে-প্রাণে প্রিন্স। টাকা-পয়সার দিক থেকেও যেরকম 'উড়নচণ্ডী' তুমি—

আমি চুপ করে গেছি। মন্দ আয় করি না, একার পক্ষে যথেষ্ট বেশি। জমালে মন্দ হতো না, কিন্তু কার জন্য জমাবো, কেন জমাবো? জমিয়ে লাভই বা কী? বোধহয় আমার এই বেপরোয়া খরচা করার বহর দেখেই ওরা আমাকে নাম দিয়েছে 'প্রিন্স'। শুধু মেরীই আমাব এই নামটা জানে না, মোটামুটি পরিচিত আর সবাই জানে।

যাই হোক। মুবুর কথার উত্তরে বললাম, সাহেব ডেকেছিল কেন?

মুবু তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বললে, সে অনেক কথা। আপনি খেতে বসুন, বলছি।

খাবার টেবিলে বসে বললাম, আজ একটু দেরিতে বসলেও হতো।

মুবুর একটু কর্তৃত্ব করার অভ্যেস আছে। কিন্তু তা বলে দুর্বিনীত নয়। সে এমন ভাবে বলবে যে, তাতে কোন দোষ ধরার উপায় থাকে না। মুবু হাত কচলাতে কচলাতে তার অভ্যস্ত বিনীতে ভঙ্গিতে বললে, আপনি স্যর তাড়াতাড়িই খেয়ে নেন। লয়াকে তাই আমি বলে গিয়েছিলাম—

বললাম, লয়ার নিজের তাড়া নেই তাহলে, বাড়ি যাবার?

না স্যর, মুবু তাড়াতাড়ি বললো, ও আবার বাড়ি যাবে কেন, এখানকার কাজ শেষ না হলে? ও বুঝি সেই সবই বলেছে? লয়া—

ওর হাঁক-ডাকে লয়া এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে। মুবু চট্ করে ওর কাছে সরে গিয়ে ওকে ধমকে উঠলো,

লয়া ? স্যরকে তুই কী বলেছিস ?

আমি খাওয়া শুরু করেছিলাম, তাই উঠতে পারছিলাম না টেবিল ছেড়ে। অথচ, আমার ওঠা উচিত ছিল। মুবুর ধমকের উত্তরে লয়া মিনমিন করে কী বলতেই মুবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওর ঘাড় ধরে বেশ কতক ঝাঁকি দিলো আর বললো, আবার মুখের ওপর কথা ! বড়ো বাড় বেড়েছে না ?

আমি চিৎকার করে উঠলাম, মুবু ! করছো কী ! ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দিতেই লয়া মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। বড়ো করুণ আর অসহায় ওর দৃষ্টি। ব্যথায় আর অপমানের চোখে জলও এসে পড়েছে। মুবু ছাড়তেই ও তাড়াতাড়ি দরজার আড়ালে চলে গেল।

সবই ঘটে গেল চকিতের মধ্যে। আমি রীতিমত বিরক্ত হয়েছিলাম, রেগেও গিয়েছিলাম। বললাম, ছি ছি ! মেয়েছেলের গায়ে হাত ! আর তাছাড়া, কী এমন অপরাধ, যে—

মুবু আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল। গলার স্বর নামিয়ে বললে, স্যর, ওদের লাই দেবেন না। কথায় কথায় শাসন না করলে ওরা পেয়ে বসে।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ওর এই হৃদয়হীন অভদ্র ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছিলাম। এর আগে এ সব ব্যাপার আমার চোখে পড়েনি। আর পড়বেই বা কী করে ? লয়াকে আমি দেখেছিই বা কতটুকু ? আজ মুবু না থাকতেই লয়া অমন করে সামনে এলো বলা চলে।

একটুক্ষণ থম্‌কে থেকে তার পরে বললাম, তুমি কি এর সঙ্গে এমনিই ব্যবহার করো নাকি ?

তা একটু করতে হয় বইকি স্যর, দু-একটা চড়-চাপড়—

বললাম, কিন্তু আমি এসব পছন্দ করি না, মুবু।

মুবু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারলো না। তারপরে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে

বললে, এই দ্বীপে ত বেশ কিছুদিন ধরে আপনি আছেন স্যর, হালচাল এখনো বোঝেননি? সব বাড়িতেই ঝি-চাকরদের ওপর এমনি শাসন চলে। নইলে ওরা বাগ মানে না।

নিজেকে ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছি, বললাম, লয়া কোন প্রতিবাদ করে না? কিছু বলে না?

বলবে আবার কী! মুবু বললে, সে সাহস ওর হবে কোথা থেকে?

বললাম, কিন্তু কেন, তোমাকে এত ভয় করে কেন?

মুবু বললে, করবে না কেন? ওতো আমাদেরই জাতের মেয়ে। আমাদের জাতে মেয়েরা পুরুষদের রীতিমত ভয় করে চলে।

বললাম, সে যাই হোক, আমি যেন ওসব আর না দেখি।

মুবুর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। মুখটা ফিরিয়ে সে বললে, তাই হবে স্যর।

আমি মুবুর মুখের দিকে তাকালাম। আগেই বলেছি, ও এমন একটি মানুষ, ওর ওপর রাগ করা চলে না। বললাম, অভিমান হলো বুঝি?

মুবু উত্তরে থমথমে গলায় বললো, না স্যর, আমাদের আবার অভিমান কী! চাকর বাকর মানুষ।

বললাম, কিন্তু তুমি ত চাকর নও। তুমি ত 'কুক্', তুমি—

ও মুখ তুলে বললে, আমি ত তা-ই জানতাম। চাকররা 'কুক'-এর আওতারেই থাকে, তার ব্যবস্থায় মনিব কখনো হস্তক্ষেপ করে না।

বললাম, নাও বাবা, তা-ই হবে। তোমাদের জাতের মেয়ে, তোমার বাধ্য, তুমি যা খুশি তাই করো, কিন্তু আমার সামনে নয়। আমি ওসব দেখতে পারি না।

মনে হলো, মুবু কথাটায় একটু খুশি হলো। বললাম, সাহেব ডেকেছিল কেন?

ও কাছে এসে, মেঝের কার্পেটের ওপর উবু হয়ে বসলো, তারপরে ওর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, যেন কতো গোপন কথা বলছে, এমন ভাবে

বলতে লাগলো, আমাকে স্যর ছুদিন ছুটি দিতে হবে। সাহেব আপনাকে ডেকে কাল বলবে। ঝিন্নুকের জন্য সাহেব ডুবুরি নামাবে, সঙ্গে আমাকেও থাকতে হবে। অবশ্যি, যদি আপনি অনুমতি দেন। সাহেবকে আমি তাই বলেছি। বলেছি, সাহেব, আমি প্রিন্সের কাজ করি এ-কথা ভুলবেন না।

বললাম, আপত্তি আমার নেই, কিন্তু সে ছুদিন আমার কী হবে?

বললে, লয়া রইল, লয়াই সব করবে খন।

পারবে ত?

মুবু বলল, না পারলে আমি ফিরে এসে ঘা কতক—

আমি মুখ তুলে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। বললাম, আবার?

ও অপ্রতিভ হয়ে আসছিল, পুডিংয়ের প্লেটটা টেনে নিতে নিতে বললাম, আড়ালের ব্যাপারে আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু আবার বলছি ভেবে দেখো। কাজটা কি ভালো?

মুবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। এর মধ্যে অপরাধটা কোথায়, তা যেন কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না।

বললাম, আচ্ছা, ও যে মুখ বুজে তোমার হাতের মার খায়, ওর কেউ নেই? তারা আপত্তি করে না?

কেউ নেই স্যর, কেই নেই, মুবু বললে, কে ওর মা, কে ওর বাপ, ও নিজেই কি জানে? ও কেন, অনেকেই জানে না। আমিও জানি না স্যর ও-ও অনাথ আশ্রমে মানুষ, আমিও তাই। বড়ো হওয়া মাত্রই ওরা ছেড়ে দেয়, বলে, এবার খেটে খাও।

আমি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, চমৎকার!

মুবু উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকলো, লয়া, লয়া?

লয়া তেমনি নতমুখে প্রবেশ করলো, তারপরে নীরবেই প্লেটটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমরা ছুজনেই ওকে দেখলাম, কেউ কিছু বললাম না। ঘর থেকে ও অদৃশ্য হবার পর আমি বললাম, এমন শান্ত মেয়ে, ওর গায়ে হাত

তুলতে তোমার মায়া হয় না?

মুবু বললে, মারের ভয় আছে বলেই শান্ত হয়ে থাকে। তা না হলে—

আমি আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। এখন ঘুম না আসা পর্যন্ত বই নিয়ে পড়বো। লয়া একসময় চলে যাবে, বাড়িতে থাকবে মুবু। এই-ই রোজকারের নিয়ম।

রাত বাড়তে লাগলো। টের পেলাম, লয়া একসময় চলে গেল।

আকাশে চাঁদ নেই। বাইরেটা রীতিমত অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই তরুণী মেয়েটি একা একা চলে গেল। মুবু ওর হাতে টর্চটাও দিলো না। একবার মনে হলো ডেকে বলি, ওকে টর্চটা দাও, যাবে কি করে? এই ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে?

কিন্তু থাক। মুবু আবার হয়ত বলবে, ওদের লাই দেবেন না। ওরা এতেই অভ্যস্ত।

পরক্ষণে ভাবলাম, বরং বলি কাঁচা বয়স, অন্য ভয়ডরও ত আছে?

কিন্তু সেক্ষেত্রেও মুবু কী বলে বসবে, কে জানে!

আমার মধ্যে এইরকম একটা উদাসীনতা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। হঠাৎই ওদের ব্যাপারে ক্ষণিকের জন্য হলেও উদাসীন হয়ে উঠলাম। আমার ভেতরে যে চিৎবৃত্তি আমাকে আমার মা-বাবা আর দেশ সম্বন্ধে হঠাৎ উদাসীন করে তুলেছিল, সেই প্রবণতাই আমার চিত্তের ওপর ক্ষণকালের যবনিকা টেনে দিলো। ভাবলাম যাকগে, ওদের ব্যাপারে আমার নাক না-গলানোই ভালো।

রাত বাড়লো। মুবু দরজা-টরজা সব বন্ধ করছে টের পেলাম। একবার আমার ঘরে ও উঁকি দিয়ে গেল চুপি চুপি। আমি তখন ডানলোপিলের গদী মোড়া আরাম কেদারায় বসে ঘোমটা টানা সেজ-বাতির আলোর পাশে একটা হালকা বই পড়বার চেষ্টায় ডুবে আছি।

মুবুর একটা শ্রদ্ধা আছে পড়াশুনার ব্যাপারে, আমাকে পড়ায় মন দিতে দেখলে ও কখনো আমার শান্তিভঙ্গ করে না। বরং অন্য ঘরে,

লয়া-টয়ার সঙ্গে কথা বলতে গেলে গলা চেপে ফিসফিস করে কথা বলার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, সেই ফিসফিস-স্বর এই বাংলো বাড়িটার যে কোনো প্রান্ত থেকে শোনা যাবে। আর বাইরে মুবু বলে বেড়ায়, প্রিন্স দারুণ পণ্ডিত মানুষ, ভীষণ বই পড়ে।

আমি কথাটা শুনে মনে মনে হাসি। গুচ্ছের সময়-কাটানোর মতো সস্তা বই পড়লেই যদি পণ্ডিত হওয়া যেতো, তাহলে ত আর কথাই ছিল না!

কিন্তু সে যাই হোক, আমার কিন্তু 'উডহাউস'-এ মন ছিল না। মুবু, লয়া, আমার অফিস, কাওয়াসজী, ডক্টর টমাস, সবার কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ একসময় যার কথা সব থেকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো, সে হচ্ছে মেরী।

মেরী মেমসাহেব, কিন্তু মুখের ভাবটা ভীষণ কোমল, ওর মুখের ভাবে কোথায় যেন একটা আমার দেশের ভাব লুকানো আছে, কথা-বলার ধরনে, মাথা বা হাত নাড়ার ভঙ্গিতে একটা অ-মেমসাহেব-সুলভ মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে। আর, সে-ভঙ্গি এই দ্বীপের নয়, সে ভঙ্গি আমার দেশের। কখনো ওকে বলিনি, মনে মনে পুষে রেখেছি। এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, হয়ত বা আমারই ভুল। আমার অবচেতন মন সবাইকেই আমার দেশের লোক ভেবে চলেছে।

মেরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও অদ্ভুত। যাকে বলে কথা বলার সম্পর্ক। এক ধরনের খেলা, তাছাড়া আর কী? অন্তত এতকাল আমি তাই জানতাম। ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফেরার পর যেমন খেলার মাঠ আমাকে প্রবলভাবে টানতো, তেমনি করে বিকেল পাঁচটায় গর্ডন স্কোয়ার আমাকে আকর্ষণ করে, এই পর্যন্ত। এর বেশি কিছু মনে হয়নি কোনদিন।

সন্ধ্যে পর্যন্ত গল্প করে বাড়ি এসেছি, স্নান করে খেয়ে দেয়ে 'পিয়ারী ম্যাসন' কি 'আগাথা ক্রিস্টি' কি 'এডগার ওয়ালেস'-এ ডুবে গেছি, ওর কথা মনের কোণেও স্থান পেতো না। সকালে অফিসের আশু করণীয় যা কিছু, তাই মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতো, অন্য কিছু

ভাববার অবকাশ থাকতো না।

অফিসে আমার চেহারা অন্যরকম। কাজ ছাড়া আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘর ছাড়বার পর মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা জাগতো। তখন আর কিছু ভালো লাগতো না, গর্ডন স্কোয়ার আমাকে টানতে শুরু করতো দুর্নিবার আকর্ষণে।

মেরীর মুখ টিপে হাসবার ধরনটা অনবদ্য। ওর সেই টুকটুকে ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটের হাসিটুকু আমার বরাবর মনে পড়তো। একবার কী কারণে যেন ও একটা খুব দামী ভায়োলেট রঙের গাউন পরে এসেছিল, সেদিন ওকে ভালো লেগেছিল নিদারুণ, কতদিন মনে হয়েছে বলি, তোমার সেই ভায়োলেট পোশাকে আর একদিন দেখা দাও না?

কিন্তু আশ্চর্য, লাজুক-প্রকৃতির মানুষ আমি নই, তবু মুখ ফুটে কথাটা ওকে আর কোনদিন বলা হয়ে ওঠেনি। ওর লণ্ডনের কাছের কোন্ এক বিভার্লি গ্রামের কথা, ওর সঙ্গে বুড়ো ফ্রীম্যানের প্রথম দেখা হওয়ার কথা, এসবই শুনে গেছি একাগ্রমনে। অর্থাৎ এযাবৎ শুনেই গেছি, কিছু শোনানো হয় নি।

বই মুড়ে রেখে, আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার ঘরের জানালাগুলো খুব বড়ো বড়ো, শোবার আগে একটা জানালার মোটা পর্দা সরিয়ে দিয়ে এলাম। চাঁদ ওঠেনি, আবছা আবছা তারার আলো ঘরে এসে পড়লো। সেই দিকে তাকিয়ে মেরীর কথা, বিশেষ করে মেরীর চিঠির কথা ভাবতে লাগলাম। ও লিখেছে আমি শীগ্‌গিরই চলে যাবো, এর অর্থ কী? তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কী এমন নতুন এবং বিশেষ কথা?

পরদিন, অফিসের পর পাঁচটার একটু আগেই গিয়ে উপস্থিত হলাম গর্ডন স্কোয়ারে। যেখানে ব্যাণ্ড বাজে, তার ঠিক উল্‌টো দিকে, যেখানে গোটা তিনেক পামগাছ পরস্পরের দিকে মাথা হেলিয়ে জটলা করছে, সেখানে, ঘাসের ওপর চুপচাপ বসে আছে মেরী। কচি কলাপাতা রঙের একটা গাউন পরণে, বুকের কাছে একটু

রূপালী নক্সা করা। বিকেলের ম্লান রোদ্দুর তার ওপর পড়ে চিকচিক করছে।

আমাকে কাছে আসতে দেখে চোখ তুলে তাকালো। কিন্তু কিছু বললো না। মুখখানা থমথমে। অনেক কাঁদলে মেয়েদের মুখ যেমন দেখতে হয় ঠিক তেমনি।

ওর কাছ ঘেঁষে ঘাসের ওপরই বসে পড়লাম। ও কিছু বলছে না, ঘাসের একটা লম্বা ডগা ছিঁড়ে নিয়ে সেটার ওপর হাত বুলোচ্ছে। ওর নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কথা বললাম।

বললাম, কাল বাড়িই যখন গেলে, তখন অতো তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন?

চোখ তুলে তাকালো, গম্ভীর গলায় বললো, লোকটা কে?

বললাম, কাল যে আমার সঙ্গে ছিল! ডঃ টমাস, একজন হিস্টোরিয়ান।

হিস্টোরিয়ানের সঙ্গে তোমার এত ভাব কেন?

বললাম, ভাব কোথায়? কালই সবে আলাপ হলো।

অভিমান স্ফুরিত অধরে বললে, ওকে নিয়ে হন হন করে চলে গেলে, আমার জন্যে আর একটু দাঁড়াতে পারলে না? না হয় একটু দেরি করেই এসেছিলাম।

চুপ করে রইলাম।

ও বললো, কী করবো বলো? কালকের জাহাজেই ওরা এলো। আমাদের পাশের বাড়িতে এসে উঠলো। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা দেখনি?

কারা ওরা?

বললে, ওভারসিজ কর্পোরেশনের ম্যানেজার হয়ে এসেছেন মিস্টার জোসেফ হউফম্যান। আসলে জার্মান ইহুদী, তবে ইংল্যাণ্ডে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করেছেন। ইংরেজই হয়ে গেছেন বলতে পারো। ওঁর স্ত্রী প্যামেলা খাঁটি ইংরেজ।

ও থামলো। বললাম, চিঠিতে লিখেছো, 'শীগ্‌গিরই চলে

যাবো। এর মানে কী?

থমথমে গলায় মেরী বললে, টাকা ফুরিয়ে গেছে, ব্যাঙ্কের কী গোলমাল হয়েছে, ওকে লণ্ডনে না গেলে চলবে না। পরের জাহাজে যেতে বলছি, কিন্তু ভীষণ খেয়ালী মানুষ ত, এখ্‌খুনি যাওয়া চাই। তাই, একটা কার্গো জাহাজ ধরে মালাগাসী যাচ্ছে পরশুদিন ভোর বেলায়, সেখান থেকে উইক্‌লি প্লেন ধরে সোজা লণ্ডন। ফিরে আসতে কোন্ না পনেরো দিন, হয়ত একমাসও হতে পারে। এই একমাস তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

কথাটার মধ্যে একটা বিষণ্ণতার সুর ছিল, আমাকেও তা স্পর্শ করেছিলো।

ততক্ষণে ব্যাণ্ডটা বাজতে শুরু করে দিয়েছিল। কাছাকাছি ছুটোছুটি করছিল যে সব ছেলেমেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে ঐদিকে ছুটে গেল।

বললাম, মিস্টার ফ্রীম্যান কী করছেন?

বললে, জিনিষপত্তর গোছাচ্ছে।

তুমি যে চলে এলে, কিছু বললো না?

বলবে আবার কী? বিকেলে ফাঁকায় একটু না বেড়ালে আমার মাথা ধরে, এটা ও জানে না?

বললাম, অদ্ভুত মানুষ। বেল অস্থি্তে পয়সা খরচ করে পাথর ফাটাচ্ছেন গুপ্তধনের আশায়!

ও একটা পাগল! মেরী বললে, লোকে এখানে ওকে পাগল বলে তা জানো? গুপ্তধন ও কোনোদিন পাবে না, শুধু পাউণ্ডের পর পাউণ্ড গলে জল হয়ে যাবে।

তুমি বারণ করো না কেন?

কে শুনছে আমার বারণ?

বললাম, মেরী, এ সবই হচ্ছে ভাগ্য। আমাকে দেখ, কোথাকার লোক কোথায় এসে পড়েছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি ইণ্ডিয়ান?

মেরী আমার চোখের দিকে তাকালো। একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধতা

আর আগ্রহ ফুটে উঠেছে ওর চোখে। বললে, তা আর জানি না? নইলে এতলোক থাকতে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালাম কেন?

ইণ্ডিয়ানদের খুব ভালোবাসো বুঝি?

চোখ ছল ছল করে উঠলো। মুখ নামিয়ে আবেগ কম্পিত গলায় বললে, ভালোবাসবো না! আমি নিজে যে ইণ্ডিয়ান।

ভয়ানক চমকে উঠলাম, বললাম, তার মানে?

ও হাঁটুদুটো মুড়ে বসেছিল, এবার বাঁ হাতটার ওপর ভর রেখে আমার দিকে একটু ঝুঁকে এলো, বললে, আমার এ পরিচয় কখনো দেইনি। এ পরিচয় কেউ জানেও না। আমিও জানাতে চাইতাম না। কিন্তু কাল তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলুম না, তার ওপরে হঠাৎই চলে যেতে হবে, সব মিলিয়ে এমন একটা মানসিক অবস্থা দাঁড়ালো যে, কথাটা অন্তত তোমাকে না বলে পারছি না। কাউকে বলো না, বিশেষ করে আমার স্বামীকে কিছুতেই নয়। ওর আবার বর্ণের আভিজাত্য ভীষণ। ও যদি জানতে পারতো যে, ইণ্ডিয়ার রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, তা হলে আমাকে কিছুতেই বিয়ে করতো না। ওকে আমি ঠকিয়েছি। এমনই টাকার লোভ! আসল পরিচয় না ঢেকে রাখলে ওকে আমি বিয়ে করতে পারতুম না।

একসঙ্গে ও কথাগুলো বলে একটু হাঁপাচ্ছিলো।

আমি ওর হাতের মুঠির ওপর হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললাম, মেরী!

এ যাবৎ পাশাপাশি বসে আমরা গল্প করেছি, সম্পর্ক ছিল কথা বলার, ওকে ছোঁয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি কখনো। আজ সে আড়াল আমিই ভাঙলাম প্রথম। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, ওর সারাটা দেহ যেন শিউরে উঠলো, মুখে একটা লালিমার আভা দেখা দিলো। হাতখানা ধীরে ধীরে ও ছাড়িয়ে নিলো, বললে, আমি কলকাতার মেয়ে, তা জানো?

মানে!

ও বললে, আমরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। নিশ্চয়ই তোমাকে এর

বেশি কিছু বলতে হবে না। ছোটবেলা থেকেই কিন্তু অন্যভাবে আমরা মানুষ। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হলেও আমার বাবা-মা উভয়েই 'হোম' বলতে ইংল্যাণ্ডকে বোঝাতেন। সব সময় চলত হোমের গল্প, ইণ্ডিয়াকে ওঁরা আপন দেশ বলে ভাবতেই পারতেন না। বাবা ভালো চাকরিই করতেন। রিটায়ার করে মাকে আর আমাকে নিয়ে 'হোম'-এ চলে এলেন। আমিই ওদের ছোট মেয়ে, যাকে বলে কোলের মেয়ে। আমার দাদা-দিদিরা ওখানেই রয়ে গেল, তাদের বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে, যার যার নিজের সংসার। লণ্ডনে এসে আমরা প্রাণপণে খাঁটি ইংরেজ হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমরা তখন ভুলেও পরিচয় দিতাম না যে, ভারতীয় রক্ত আমাদের শরীরে বইছে। এইরকম পরিবেশেই আমি প্রাপ্তবয়স্ক যুবতী হয়ে উঠলাম। দিনকতক বেশ কাটলো, আমার চেহারাটা ঝকঝকে থাকায় মোটামুটি ওদের সঙ্গে খানিকটা মিশেও গেলাম। কিন্তু ইংরেজদের আভিজাত্য-জ্ঞান অতি টনটনে,তারা আমাদের একেবারে আত্মীয় বলে ভাবতে পারলো না। আমার মা আর বাবা দুজনেই বারবার ঠোক্কর খেতে লাগলো। গরীব যারা, তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়, কিন্তু মা-বাবার চাহিদা অন্য, তাঁরা ইংরেজ সমাজেও কেউ-কেটা হতে চান। আমার স্বামী একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের, তাকে ধাপ্পা দেওয়া কঠিন হলো না, বিশেষ করে সে যখন লণ্ডনে থাকবে না, দূর দেশে চলে আসবে। মা-বাবা খুশি, কিন্তু এখানে এসে, যত দিন যাচ্ছে, ততই আমার মনের অবস্থা বদলে যাচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে, স্বামীকে বলে ফেলি যে, আমি ইণ্ডিয়ান। কিন্তু ওঁর আভিজাত্য জ্ঞান এমন টনটনে যে তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আবার এই যে লণ্ডনে ফিরে যাবো, সেখানে গিয়ে ক্ষ্যাপা লোকটা না জেনে ফেলে আমার আসল পরিচয়! এই মানসিক দ্বন্দ্বে আমি অস্থির হচ্ছি। তোমার কী পরামর্শ, ওকে খুলে বলবো?

আমি অসীম আগ্রহ নিয়েই ওর কথা শুনছিলাম। ততক্ষণে স্যার গর্ডন স্কোয়ার প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, ব্যাণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে,

গোধূলির হরিদ্রাভ আলো মুছে গিয়ে চারিদিক কালো হয়ে আসছে। শুধু স্কোয়ারের বৈদ্যুতিক বাতিগুলি সতর্ক চোখে পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওর কথার উত্তরে সংক্ষেপে বললাম, না। যেমন ভাবে চলছে চলতে দাও।

মেরী আমার হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিলো, বললে, কিন্তু বন্ধু, আমার মনের জ্বালার কী হবে? কখনো এমন ছিল না, আমিও নিজেকে ইংরেজ ভাবতাম, ইংল্যাণ্ডকে ভাবতাম 'হোম', কিন্তু এই সিচেলাস দ্বীপে এসে ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে এ ঝড় উঠলো কেন? জানো, আমি কলকাতাকে স্বপ্নে দেখি? চৌরঙ্গী-ময়দানের বড়ো বড়ো গাছগুলো কারা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলেছে, এ স্বপ্ন আমি দুবার দুরকম করে দেখলুম।

কলকাতা সম্পর্কে কলকাতাবাসী হয়ে আমার দুর্বলতা থাকাও স্বাভাবিক, তাই তাড়াতাড়ি বললাম, ও কথা থাক। রাত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!

মেরী একটু চমকে চারদিকে তাকালো, তারপরে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, তাই ত। এবার উঠতে হয়। আজ 'দমদম রক' -এ পাথর ফাটানোর কাজ হয়নি, সাহেবের মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। কী জানো, ও একেবারে যেন ফিউডাল-লর্ড। ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে দেখো।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, এবার ঘনিষ্ঠ ভাবেই আলাপ করবো। তোমরা 'হোম' থেকে ফিরে এসো।

ও চলবার জন্য পা বাড়িয়েও থম্‌কে দাঁড়ালো, ভয় হচ্ছে যদি 'না' ফিরি?

কেন, এ ভয় কেন? বললাম, ফ্রিম্যান সাহেব ফিরবেই, গুপ্তধন খোঁজা ওর নেশা!

তা জানি, মেরী বললো, আমার ভয় অন্য জায়গায়। কথায় কথায় যে রকম অভিজাত ঘরের মানুষ বলে বড়াই করে, যদি জানতে

পারে আমি অভিজাত নই, তাহলে কী হবে?

বললাম, স্বামীকে তুমি খুব ভালোবাসো, না? তাই এতো হারাবার ভয়?

ও আমার মুখের দিকে একটু অবাক অবাক চোখেই তাকালো, ভ্রূ-রেখায় একটু কুঞ্চন জাগালো, তারপরে নিচের ঠোঁটের কোণ্ একটুক্ষণ কামড়ে ধরে কী যেন ভাবলো, তারপরে অন্যমনস্কের মতো বললে, ভালবাসি! হবেও বা। আচ্ছা, গুড নাইট।
বলে, হঠাৎই সমস্ত প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে দ্রুত পায়ে একা একা চলে গেল গেটের দিকে, পিছন ফিরে যেমন রোজ তাকায়, তেমনি একটি বারের জন্যও আর তাকালো না।

আমি বাড়ি ফিরলাম এলোমেলো নানান চিন্তার ভিড় মাথায় নিয়ে। প্রথমেই মনে হলো, হঠাৎ ও অমন করে চলে গেল কেন? তারপরে মনে হলো, রওনা তো হচ্ছে পরশু সকালে, কাল পাঁচটায় স্কোয়ারে ও আসবে কী? সময় পাবে কি ও আসবার? বোধহয় না। মনে মনে ঠিক করলাম, কাল অফিসের পর সোজা বাড়ি চলে আসবো, স্কোয়ারে আর যাবো না। যাবার দরকারই বা কী?

তাই হলো, পরদিন বিকেলে গর্ডন স্কোয়ার আমার মনটাকে টানতে থাকলেও জোর করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অফিসের গাড়িটাতে উঠে বসলাম। পুরনো মরিস গাড়ি, অফিসের বেয়ারারা নাম দিয়েছে 'বেবি কার', এটাই সকালে আমার বাংলোতে যায় আমাকে আনতে, বিকেলে সচরাচর গাড়ি নেই না, স্কোয়ার হয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরি। জনৈক সহকর্মী তখন এটা ব্যবহার করেন। তাঁর বাড়ি অবশ্য কাছেই, তাঁকে পৌঁছে গাড়ি ঘুরে আসতে লাগলো আমার বাংলোর দিকে।

মোটর পথে আসতে গেলে ডানদিকে পড়ে ফ্রিম্যানের সেই 'দমদম রক', আর তার পরেই বেল অস্থির বস্তি। রাস্তাটা এখানে একটু উঁচু, গাড়ি থেকেই নজরে পড়ে ওদের পল্লীর দৃশ্য। মাঝখানে একটা বারো ফুট রাস্তা সোজা চলে গিয়ে একটা বিরাট পাথরের গায়ে

ধাক্কা খেয়েছে। তার তুপাশে তু-ধরনের ঘরের সারি। একদিকে থাকে ক্রিয়োলরা, অন্যদিকে নিগ্রোরা। মাঝের রাস্তাটিতে মুরগি চরে বেড়াচ্ছে, মেয়েরা জল বয়ে আনছে, তু-একজন পুরুষ কাজ সেরে ফিরছে। বেল-অম্বি র দৃশ্য ছায়াছবির মতো কয়েক মুহূর্ত চোখের সামনে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পর মুবু বললে, স্যর, কাল থেকে আমার ছুটি কিন্তু, মনে আছে ত?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আশ্চর্য! একেবারে ঠিক কাল থেকেই তোমার ছুটি?

ও আমার প্রশ্নের ধরনটা ঠিক ধরতে পারলো না, মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। হেসে ফেললাম, মুবু, আজ একটু গরম পড়েছে, না? দেখছো না, কীরকম গুমোট? নারকেলগাছগুলোর পাতা নড়ছে না?

ও চারিদিকে তাকিয়ে তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালো, বললে, বলছেন কী স্যর, আমার ত মনে হচ্ছে ঠিক উল্টো ব্যাপার। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

দূর! বললাম, চলো চা খেয়ে একটু সমুদ্র-স্নান করে আসি।

বলছেন কী প্রিন্স, ও বললে, সারা গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা হবে যে?

হোক।

মোট কথা, আমার মন একটা উত্তেজনা চাইছিল। অবশ্য, এই রকম মানসিক উত্তেজনা থেকে রেহাই পাবার আরও অনেক উপায় আছে। মূল শহরে ক্লাব আছে, ক্লাবে নাচ আছে, তাছাড়া আছে একটা সিনেমা হাউস। প্রায় বছরই একবার করে বিলেত থেকে পার্টি আসে, কখনো আসে নাটকের দল, কখনো আসে নামকরা কোনো পিয়ানো-বাদক, কখনো সিম্ফনী-অর্কেস্ট্রা। একটা না একটা উত্তেজনার খোরাক শহরে লেগেই আছে, নইলে এখানকার এই শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন ভীষণ একঘেঁয়ে হয়ে উঠতো।

বলা বাহুল্য, সে সব আমোদ প্রমোদে আগে আমারও খুব উৎসাহ ছিল, কিন্তু আজকাল ইহুদী মেনুহিন, কিম্বা ওল্ড ভিক কোম্পানী, কোনটাই আমার মন টানে না।

মনে পড়লো, অফিস থেকে ফেরার সময় সিনেমা হাউসটার সামনে (ওটাকে সবাই বলে অপেরা হাউস) স্ট্যাণ্ডের ওপর বড়ো একটা প্লেট রেখে বাইরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে খড়ি দিয়ে লেখা, কে একজন বিখ্যাত জার্মান বাদক দ্বীপে এসেছেন, তিনি আজ রাত সাতটায় পিয়ানো বাজাবেন! প্লাকার্ড নেই, জমকালো পোষ্টার নেই, শুধু এমটা প্লেটের উপরে খড়ি দিয়ে লেখা। ব্যস, এতেই সারা ভিক্টোরিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে, বড়োলোকেরা ত যাবেই, তারপর উচ্চ ও নিম্নবিত্তেরাও বাদ পড়বে না। বাকি থাকে শ্রমিক গোষ্টী, এবং সংখ্যায় এরাই বিপুল। কিন্তু এদের কথা কে ভাবছে! এদের যারা লীডার গোছের, তারা হয়ত শহরে 'ভি-আই পি' দের মতোই নিমন্ত্রণ লিপি পাবে, তাদের কথা আলাদা।

কিন্তু এসব উত্তেজনায় আমার মন আর টানে না। আমি মুবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই উপহ্রদ বা লেগুনে কেউ স্নান করে না, তবে বোটে করে হ্রদে বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ বোট বা মোটর-বোট ভাড়া পাওয়া যায়। সেই বোটে উঠে লেগুনের পরপারে দুপাশ থেকে যে দুটি ভূমিরেখা পরস্পরের সঙ্গে মিলতে গিয়ে থম্‌কে থেমে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তারই ডান-দিককার বাহুটির সংলগ্ন সমুদ্র-স্নানের ক্লাব আছে। ওখানে সমুদ্রের ঢেউ এসে তীরভূমিতে আছড়ে পড়ে, ওখানে ঢেউ-ভাঙা ব্রেকারের দেখা মেলে, সার্ক বা হাঙরের ভয় নেই।

স্নান শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমার মতো আরও লোক ছিল, পুরুষ ও রমণী। একে একে সবাই ফিরছে দেখে আমরাও ফিরলাম।

মুবু স্নান করেনি, ওরা সমুদ্র-স্নান বড়ো একটা করেও না, স্নানের বিলাস ইউরোপীয়দের মধ্যেই বেশি।

আমি এদিকে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করে করে রীতিমত পরিশ্রান্ত। বোটে করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আর একটু বাড়লো। বাথরুমে গিয়ে আবার গায়ে জল ঢেলে লোনা জল ধুয়ে ফেললাম।

ততক্ষণে ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। আমার বাথরুমে থাকার সময়ই মুবু খাবার টেবিল গুছিয়ে ফেলেছে। বড়ো চিংড়ি দিয়ে একটা স্যালাড করে মুবু মাঝে মাঝে, বড়ো ভালো লাগে খেতে। সেটা টেবিলে দেখে খুশি হলাম। আমাকে তখনকার খাবার টেবিলে কেউ দেখলে নির্ঘাৎ 'মহা পেটুক' আখ্যা দিতো। দৈত্যের মতো খাবারগুলো সব সাবাড় করলাম।

তারপরের ঘটনা নিয়ম-মাফিক। ইজিচেয়ারে খানিকক্ষণ বসে বই পড়া, তারপরে শুতে যাওয়া। শুতে এসে অনুভব করলাম, মুবু ঠিক কথাই বলেছিল, হাত পা ভীষণ কামড়াচ্ছে। মুবুকে ডেকে পা টেপার কথা কখনো বলা যায় না, হাজার হলেও ও কুক. ওদের ঠিক পা-টিপিয়ে-চাকরদের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি, এমন সময় মুবু ঘরে এলো, ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ওর পিছনে পিছনে, লয়া। একটু অবাক হয়ে বললাম, একী! লয়া বাড়ি যায়নি?

লয়া তেমনি অবনতমুখী, তেমনি জড়োসড়ো। মুবু ওর দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে নিয়ে বললো, যাচ্ছিল, আমি আটকে দিলাম।

কেন?

মুবু বললো, যাবেখন একটু পরে।

বলেই ওর দিকে ফিরে একেবারে খেকিয়ে উঠলো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কী! মারবো এক থাপ্পড়।

সত্যি সত্যি ওর দিকে চড় উঠিয়েছিল মুবু, লয়া ভয় পেয়ে সরে গেল। মুবু বললে, যা গিয়ে বোস সাহেবের কাছে। যা?

আমি ততক্ষণে উঠে বসেছি। এসব কী বলছে মুবু! এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি এবং অন্যায়!

কিন্তু কিছু বলবার আগেই লয়া এসে আমার বিছানার কাছে

মেঝের ম্যাটিংয়ের ওপর হাঁটু মুড়ে বসলো। মুবু বললে, আপনি শুয়ে পড়ুন প্রিন্স, ও আপনার পা টিপে দেবে!

লজ্জায় কানের কাছটা মুহূর্তে গরম হয়ে উঠলো। লয়া হাজার হোক মেয়ে, এবং তরুণী, ও এভাবে আমার পায়ে হাত দেবে কী?

একটা চেয়ার টেনে মুবু আমার মুখের কাছে বসলো, বললো, আপনি 'কিন্তু' করছেন কেন প্রিন্স, এখানকার এই নিয়ম। ওরা চাকর-বাকর, ওদের আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। আপনি ওকে মাইনে দেন না? খাওয়ান না? আপনার পা টিপে দিয়ে তবে ও বাড়ি যাবে আজ।

বলতে বলতে আবার তাড়া দিলো মেয়েটিকে, কী হলো, পুতুলের মতো বসে রইলি যে? মারধোর খাবি?

ভীরু হরিণীর মতোই মুবুর দিকে একবার তাকিয়ে আমার পায়ের ওপর হাতখানা রাখলো মেয়েটি। ঝিয়ের কাজ করে, হাত শক্ত হওয়ার কথা, কিন্তু পায়ে ও হাত বুলোতে আরম্ভ করতেই বুঝলাম, অতি কোমল মেয়েটার হাত। সেই ঈষদুষ্ণ কোমল হাতের স্পর্শে কার না লোভ হয়? আমি বিছানায় পা উঠিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পা দুটি সত্যিই কামড়াচ্ছিল খুব। লয়া ধীরে ধীরে পা টিপতে শুরু করলো, আর মুবু কানের কাছে বক বক করতে লাগলো।

যখনকার কথা বলছি, তখন সিচেলাস দ্বীপে একটা নতুন জাতীয়তার ঢেউ বইছিল। আগে আগে কে নিগ্রো, কে ক্রিয়োল, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না, বিশেষ করে শ্রমিকদের মধ্যে। আজকাল দেখছি, কে কী জাত, এসব নিয়ে বেশ একটা আত্ম-সচেতনতা এসেছে। মুবুরও সেই ব্যাপার, কবে যে এই দ্বীপে ওর পূর্বপুরুষরা এসেছিল, তা ও বলতে পারে না। তবে লোক পরম্পরায় ও শুনে আসছে, ও আফ্রিকার লোক এবং ওর আসল দেশ গোল্ড-কোস্টের উত্তরাঞ্চল।

মুবু বসে বসে সেইসব কথাই বলছিল। আমি লয়ার কোমল স্পর্শ উপভোগ করতে করতে ওর কথা শুনছিলাম। মুবু বলছিল,

ওদের পল্লীর কিনারে ওদের জাতের এক পুরোহিতের দেখা পেয়েছে সে। সে-ই ওকে ওদের জাতের ধরন-ধারণ-সম্পর্কে উপদেশ দেয়, আর ও প্রাণপণে সে-সব মেনে চলবার চেষ্টা করে।

বেশ কিছুদিন ধরে ওর মধ্যে এসব চলেছে। এদিকে খ্রীস্টান হলে হবে কী, চার্চে যাওয়া বহুদিন ও ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। এখন সময় পেলেই ও সেই পুরুতের বাড়ি যায়। আর ওদের 'জাতি' সুলভ আচার ব্যবহারের তালিম নিয়ে আসে। ওর এই প্রবণতার কথা আমি আগে থাকতেই জানতাম, ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, বারণও করেছি, কিন্তু এই জাতীয়তার ঝোঁকটা ব্যাধির মতো, যাকে ধরে, তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না।

মুবু সেইসব কথাই বলছিল, আমাদের দেশে আমাদের জাতের মধ্যে মেয়েরা কী রকম থাকে জানেন? মানুষ যেমন গরু-ছাগল পোষে ঠিক তেমনি। আমি সব শুনেছি আমাদের জাতের সেই 'প্রিষ্ট'টির কাজ থেকে। বড়ো ভালো লোক। কতো সব ব্যাপার ট্যাপার জানে! ভূত নামাতে পারে, ভূতের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কেউ পাপ করলে তার পিছনে ভূত লেলিয়ে তাকে মেরে পর্যন্ত ফেলতে পারে।

আড়চোখে দেখছিলাম, মুবুর দিকে বড়ো বড়ো দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে লয়া, যেন সমগ্র সত্তা দিয়ে ওর কথাগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে ওর হাত সঞ্চালিত হচ্ছে মাত্র, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

আমি কিছু বললাম না। মুবু বলছিল, স্যর, আমাদের ধরে জোর করে খ্রীস্টান করেছিল এখানকার মিশনারীরা, আমরা এখন সে সব ক্রশ-ট্রশ গলা থেকে খুলে ছিঁড়ে ফেলেছি। আমরা আফ্রিকান, আমাদের আসল দেশ গতবছর স্বাধীন হয়েছে, তাই না প্রিন্স?

বললাম, সে খবরটা জানো দেখছি। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ কি আবার সেই ওঝা-তাকতুকের দিনে ফিরে যাওয়া? একবার দেশে গিয়ে ঘুরে এসো দেখবে সবকিছু বদলে গেছে! বড়ো হাসপাতাল,

ডাক্তার, বড়ো বড়ো বাড়ি, স্কুল-কলেজ-ইয়ুনিভার্সিটি, তার মধ্যে তোমাদের ঝাড়ফুঁক আর মন্ত্রতন্ত্র কোথায় চাপা পড়ে আছে।

ও অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে, বললে, আপনি জানলেন কী করে?

আমি হাত দিয়ে আলমারীর বইগুলো দেখালাম। ও বললে, আমাদের দেশ সম্পর্কে বই আছে আপনার কাছে?

বই ঠিক নেই। তবে কাগজ-পত্র আসে ত? তোমাকে দেখাতে পারতাম, কিন্তু তুমি যে পড়তে জানো না।

ও বললে, পড়তে জানলেই বা কী হবে? আমাদের দেশটাকে ইয়োরোপীয়ান ধাঁচে গড়তে চাইছে। আমি জানি না ভেবেছেন? আমাদের পুরুত আমাদের সব বলেছে। তাহলে আর মিশনারীদের লোকজন ধরে ধরে খ্রীস্টান কারার সঙ্গে তফাৎ রইলো কোথায়? আমরা তাই ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের জাতের খাঁটি ধরণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।

এবার অবাক হবার পালা আমার। খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার পুরুতকে ত একদিন দেখতে হচ্ছে!

সাগ্রহে মুবু বললে, যাবেন একদিন আলাপ করতে? খুব পণ্ডিত লোক। তবে, ওর ভাষা যে আপনি বুঝবেন না! ক্রিয়োল ভাষা কিছু কিছু জানে, কিন্তু আপনি যে ক্রিয়োল তেমন ভালো বুঝবেন না।

তোমাদের মতো ভাঙা ইংরেজী ও জানে? পি-জি-য়-ন ইং-লিশ?

না স্যর, তাও না।

দেখি, কী করা যায়, বললাম, এবার তোমরা যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে।

মুবু বললে, কাল আমি থাকবো না স্যর, মনে আছে ত?

আছে।

পরদিন। অফিসের কাজে মেতে গেলাম যথারীতি। মেরী,

কী ফ্রিম্যান, লয়া, কী মুবু, ডঃ টমাস, কী মুবুর প্রিস্ট, কারুর কথা মনে রইলো না। আমার হেড ক্লার্ক, তিনি এখানকারই লোক, নির্ঝঞ্ঝাট, শান্ত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, একসময় কাছে এসে বললেন, আলদাব্রা দ্বীপে কোনো লোক পাঠাতে হবে স্যর, ওখানে কাজের খুব গোলমাল হচ্ছে।

বললাম, ঠিক আছে। দেখি আপনার রিপোর্ট-টিপোর্ট। পরে আপনাকে বলবো।

এই সব নানাবিধ কাজ শেষ করে যখন মাথা তুললাম, তখন পাঁচটা প্রায় বাজে। মনে অভ্যাসমতোই একটা তাড়া অনুভব করলাম। গর্ডন-স্কোয়ার অভ্যাস মতোই আমাকে টানতে লাগলো, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, কী জন্য যাবো! মেরী তো আজ ভোরেই চলে গেছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি যেতে মন চাইলো না। মুবুও নেই যে, বসে বসে ওর বকবকানি শুনবো। এক আছে লয়া। কিন্তু ওর সঙ্গেই বা কী কথা বলবো? মুবুর কথা যদিও হাস্যকর, তবুও মনে পড়লো, 'ওদের লাই দেবেন না স্যর, পায়ের নিচে রাখবেন।'

আমি অফিস থেকে বেরিয়ে অপেরা হাউসে ঢুকে পড়লাম সেদিন। কিন্তু ওসব বাদ্যি-বাজনা আমার বেশিক্ষণ ভালো লাগলো না, আটটা বাজতে না বাজতে উঠে পড়লাম।

মরিস-গাড়ির ড্রাইভারকে রেখে দিয়েছিলাম, বাইরে এসে দেখি, স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সে অঘোরে ঘুমচ্ছে। তাকে ডেকে তুলে বাংলোর দিকে রওনা হলাম তৎক্ষণাৎ। মনে পড়লো, আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে না নেওয়া পর্যন্ত লয়া বাড়ি ফিরতে পারবেনা।

ফেরবার সময় একটু অবসন্ন বোধ করছিলাম। অফিসে সেদিন পরিশ্রমও হয়েছিল খুব। সীটে গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিলাম। বেল-অম্বি র পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন নিগ্রোপল্লী থেকে একটা নাকাড়া-জাতীয় বাদ্যের ধম্ ধম্ আওয়াজ, সঙ্গে নাচ আর গানের আওয়াজ আর মাঝে মাঝে একটা সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি শোনা

যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটি শব্দ ফিকে ধুয়ার মতো: কোবলা-কোবলা… কে জানে কথাটার মানে কি?

এসবও এই দ্বীপে আগে ছিল না, এদের হৈ-হল্লা ছিল একরকম, নাচও ছিল একরকম। বল্‌নাচের স্টেপিং কিম্বা বড়ো জোর ফক্সট্রটের স্টেপিং। আর ছিল গীটারের করুণ কোমল স্বর, কতদিন কানে এসে বেজেছে।

এখন গীটারও আছে; সঙ্গে আরও অনেক কিছু এসেছে। অবশ্য দ্বীপের প্রাচীন ব্যাপার-স্যাপার আমারও জানার কথা নয়, আমি এসব শুনতাম বৃদ্ধ কাওয়াসজীর কাছ থেকে।

এইসব ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছলাম, ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে গেট খুলে ভিতরে এলাম। স্নান সেরে খাওয়ার পালা শেষ করে লয়াকে ছুটি দেবো, এই ছিল ইচ্ছে।

কিন্তু বসবার ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, তা দেখবো বলে কল্পনাও করিনি। একটা বই মুখের কাছে নিয়ে সোফায় বসে আছে। পরনে ভায়োলেট রঙের গাউন, বুকের কাছে রূপালী কাজ করা। অস্ফুট গলায় বলে উঠলাম, মেরী।

মুখের কাছ থেকে বইটা সরালো, বললো, দু-ঘণ্টা ধরে বসে আছি।

ওর সামনের সোফাটায় বসে পড়ে বললাম, যাও নি?

না।

যাওয়া হয়নি তোমাদের?

মেরী তেমনি সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। বললো, ও চলে গেছে। আমি থেকে গেলাম।

সে কী! কেন?

মেরীর মুখখানা বিবর্ণ দেখাচ্ছিলো। যে হালকা প্রসাধনটুকু করতো, তা-ও বোধ হয় করেনি। চুল খোলা। একটা গুচ্ছ বুকের ওপর টেনে এনেছে। সেই কেশগুচ্ছের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলো, এই 'কেন' র উত্তর চট্ করে দিতে পারবো না।

শুধু একটু বলি, যতই যাওয়ার সময় এগিয়ে আসতে লাগলো; ততই আমার মনটা বেঁকে দাঁড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে পারলাম না, ওকে সোজা বলে বসলাম, যাবোনা। প্রথমটায় আমার ফিউডাল লর্ড ক্ষেপে গেলো। শেষ পর্যন্ত কী ভেবে বললো, ঠিক আছে। আমি প্লেন ধরবো মালাগাসীতে গিয়ে। দিন পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসবো। লোন্‌লি ফিল্‌ করলে তোমার ইণ্ডিয়ান বন্ধুটির সঙ্গে গল্প করতে পারো।

ওর কথায় আমিও চমকে উঠলাম, বললাম, আমাকে চেনে!

সেটাই আশ্চর্য! মেরী বললো, লর্ড পাথর ফাটিয়ে গুপ্তধন খুঁজতেই ব্যস্ত, তার মধ্যে যে তোমার সঙ্গে আমার মেলামেশার খবরও ভিতরে-ভিতরে রেখেছে, সেটা জেনে আমিও অবাক হয়ে গেছি।

চুপ করে রইলাম। বাড়ি ফেরার পর থেকে আশপাশে লয়াকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওকে ডাকবো কিনা বুঝতে পারছি না, এমন সময় মেরীই আবার কথা শুরু করলো। বললো, ওঠো, অফিসের জামাকাপড় ছাড়বে না?

হুঁ।

উঠে দাঁড়ালাম, ডাকলাম, লয়া?

ভিতরের দরজার কাছ থেকে মৃদু স্বরে ভেসে এলো, ইয়েস প্রিন্স?

মেমসাহেবকে চা-টা করে দাও, বলে মেরীর দিকে মুখ ফেরালাম, আই সে মেরী, আমার সঙ্গে ডিনারে বসবে?

ও বললে, সেসব হবেখন।

বলে, দরজার দিকে ঘুরে তাকালো, লয়া, চায়ের দরকার নেই।

লয়া এতক্ষণে দরজার কাছে একটু দৃশ্যমান হয়েছিল, মেরীর কথায় তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। মেরী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, প্রিন্স! তুমি প্রিন্স?

হাসলাম, বললাম, ওরা ডাকে।

মেরী মুখ টিপে হাসলো, তারপরে মৃদু গলায় বললে, ব্ল্যাক প্রিন্স।

ওর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম, তার থেকে ব্ল্যাকি বলে ডাকলেই পারো। অনেক সাহেবই আমাকে ও-ভাবে ডাকে, তা জানো?

ও বললে, আমি ত আর 'সাহেব' নই?

সাহেবের বউ তো বটে, বলে হাসিমুখেই সরে এলাম ঘরে।

তারপরে স্নান সেরে, পোশাক বদলে যখন আবার ঐ ঘরে এলাম, তখন দেখি, লয়া ওর পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসে; আর ও তার দিকে একটু ঝুঁকে গভীর আলাপে মগ্ন। আমাকে দেখতে পেয়ে লয়া তাড়াতাড়ি ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো। মুখ নিচু করা সেইরকম জড়োসড়ো ভঙ্গি! মেরীকে বললাম, খাবার দিতে বলি?

মেরী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, খুব খিদে পেয়েছে?

মোটেই না। লয়াকে ছেড়ে দিতে হবে।

কেন? ও তো বললে, ও থাকবে?

থাকবে! সে কী! থাকেনা তো কখনো?

ওর মুখের দিকে তাকালাম। বললে, মুবু বলে গেছে।

মুবুর সর্দারি। তুমি বাড়ি চলে যেয়ো।

লয়া মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো, বললো, ও ফিরে এসে শুনলে, মারবে। আপনি একা থাকবেন?

রাগ করে বললাম, তুমি আমাকে পাহারা দেবে? যা খুশি করো।

ও আর কিছু না বলে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেরী অল্প একটু হাসলো, বললে, তোমার ঝি-টি ভালো। ওর কথা শুনছিলাম। অনাথা মেয়ে, কেউ কোথাও নেই।

ওর কাছে গিয়ে বসলাম, বললাম, ওর কথা থাক। তোমার

কথা বলো।

মেরী ঝুঁকে বসলো আমার দিকে, বললো, লর্ডের কথা শুনে ভয় পেলে নাকি?

কেন! ভয় কিসের?

একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে। বললো, ওর বন্দুক আছে।

থাকুক। আমিতো আর অন্যায় কিছু করছিনা। মুচকি হাসলো, বললো, করতেও তো পারো। লাইসেন্স তো পেয়ে গেছো।

কিসের লাইসেন্স?

তেমনি করে হাসতে হাসতেই ও বললো, ঐ যে বলে গেছে, বোরিং ফিল করলে তোমার কাছে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারি?

বললাম, গল্প করারই লাইসেন্স, অন্য কিছুর নয়!

মেরী মাথা দুলিয়ে এবার উচ্চকিত হেসে উঠলো। বললো, অতো মাপজোঁক করে, সীমারেখা টেনে, প্রেম করতে পারবে?

প্রেম?

হাসির ছটা মিলিয়ে গেল মেরীর মুখ থেকে, থমথমে হয়ে উঠলো ওর মুখ, আমার দিকে পরিপূর্ণ চোখ তুলে তাকালো। তারপরে আস্তে আস্তে বললো, জানিনা। মানুষ যদি নিজেই জানতো, সে কী চায়।

বললাম, তুমি গেলেনা কেন?

পারলাম না।

কেন?

গর্ডন স্কোয়ার।

মানে?

বিকেলের গর্ডন স্কোয়ারের আকর্ষণ।

স্বামীর থেকেও বেশি?

মেরী উঠে দাঁড়ালো, ধীরে ধীরে সরে গেল হ্রদ-শিয়রী জানলাটার দিকে।

ঘরে সেজ-বাতি ছাড়া আর কিছু নেই, সারা ঘরখানা আলো-আঁধারিতে রহস্যময় হয়ে আছে।

আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ও হঠাৎ বলে উঠলো, আমাকে নিয়ে যাবে? নিয়ে যাবে ইণ্ডিয়ায় ফিরিয়ে? কলকাতায়?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললাম, না।

ও আমার দিকে চকিতে ফিরে দাঁড়ালো, তেমনি ব্যাকুলতা ওর কণ্ঠে। বললো, কেন? ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তো ওকে ডাইভোর্সও করতে পারি?

বললাম, মনে মনে এতদূর এগিয়ে গেলে কী করে? বিশেষ করে আমাকে কেন্দ্র করে?

হঠাৎ কী হলো, আমার গলাটা দু-হাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো, আত্মহারার মতো আমার গালে তারপরে ঠোঁটের ওপরে এঁকে দিলো গভীর চুম্বন।

প্রতিদানে আমিও প্রমত্ত হয়ে উঠলাম। ও যেন একসময় হাঁপিয়ে উঠলো আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে। হঠাৎ বললে, ছেড়ে দাও।

বলতে বলতে নিজেকে সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে পড়লো। আমি ধীরে ধীরে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম, মেরী, এ তুমি কী করলে! আমার মধ্যে যাকে তুমি জাগালে, সে কি সহজে শান্ত হবে? পুরুষের ভালোবাসা—

মেরী গ্রীবাভঙ্গি করে আমার দিকে ফিরে বসলো তারপরে একটা আঙুল আমার ঠোঁটে ছুঁইয়ে বললে, থামো। দাস কার, এণ্ড নো ফারদার। আমার নিজের মনটাকে ভালো করে জানতে দাও।

বেশ। প্রতীক্ষা করবো।

ওর পাতলা ঠোঁটের ওপর হাসির ঢেউ জেগে উঠলো, তরল কণ্ঠে বললে, ব্লাক প্রিন্স!

বললাম, বোধহয় আমার নিজের মনটাকে আমি বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারলে?

বললাম, ভালোবাসছি।

ও হঠাৎ হেসে উঠলো। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গমকে গমকে অদ্ভুত হাসি! তারপরে হাসির বেগ স্তিমিত হয়ে যাবার পর বললে, কতো সহজেই না কথাটা বললে। এটা কি এতই সহজ?

কেন? এর মধ্যে কঠিন ব্যাপারটা কী?

ও বললে, ইয়ংম্যান, ভালোবাসার মতো কঠিন ব্যাপার আর কিছু নেই। প্রমাণ দেবো একদিন।

কী করে?

এই পনেরোদিনের মধ্যেই?

কিন্তু কী ভাবে?

ও আমার গালে মৃদু একটু টোকা দিয়ে বললে, বলবো কেন? নাও, এখন চলো, একটু পৌঁছে দেবে।

কিন্তু, ডিনার?

ফিরে এসে একা খেয়ো।

কি পাগলামি করছো! এসো না, দুজনে বসে খেতে খেতে গল্প করি।

ও উঠে দাঁড়ালো, বললো, না। খাবার পর আমার ভীষণ ঘুম পায়। যদি থেকে যেতে ইচ্ছে করে?

ওর হাত দুটো ধরে বললাম, থাকো না? মেরী, তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছো না, আমার পক্ষে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া কতো কঠিন।

ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, কঠিন কাজ তো পুরুষেই করে! ব্ল্যাক প্রিন্স, এমন করে ক্ষেপে যেয়ো না। যদি মেয়েদের কাছ থেকে সত্যিই প্রেম চাও, তাহলে প্রতীক্ষা করতে শেখো। ফুলের কুঁড়ি

যেমন করে ধীরে ফুটে উঠে এক সময় পাপড়ি বিস্তার করে নিজেকে মেলে দেয়, তেমনি করে মেয়েদের সবটাকে বিকশিত হতে দাও। মেয়েদের শরীর থেকে মন আরও বড়ো। এই মনটাকে পাবার চেষ্টা করো, দেখবে এর থেকে বড়ো আর কিছুই নেই।

মেরী!

অদ্ভুত স্নেহ ফুটে উঠলো ওর কণ্ঠে। বললো ক্ষ্যাপামী করোনা লক্ষ্মীটি। চলো, একটু এগিয়ে দেবে।

ভারতের উপকূল থেকে হাজার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ছোট্ট সিচেলাস দ্বীপপুঞ্জ। যখন সুয়েজ খাল খনন করা হয়নি, তখন এর অবস্থিতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আফ্রিকার দক্ষিণতম শীর্ষবিন্দু 'কেপ অব গুড হোপ' বা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে মাডাগাস্কারের (বামালাগাসী) পাশ দিয়ে মরিসাস দ্বীপ হয়ে তারপরে সিচেলাস (ইংরেজরা বলে, সিসেল্‌স্) দ্বীপপুঞ্জের ছোট ছোট দ্বীপের গা ঘেঁষে মালদ্বীপের উপকূল দূর থেকে দেখতে দেখতে ইয়োরোপের জাহাজ এসে ভিড়তো দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোনো বন্দরে।

সুয়েজ-খালের খনন-কার্য শেষ হবার পর ইয়োরোপ বোধহয় ভুলে গেল সিচেলাসের কথা। এই সিচেলাস-সম্পর্কে কোনো রম্যবৃত্তান্ত ভ্রমণকারীরা, ইতস্ততঃ সামান্য-কিছু লিখে গেলেও এ-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আকারে কিছু পাওয়া যায় না, অথবা এদের নিয়ে কোনো সাহিত্যও সৃষ্টি হয়নি এপর্যন্ত।

ইংরেজ নাবিকরা একে পাইরেট দ্বীপ বা জলদস্যুদের দ্বীপ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাদের ধারণা, জলদস্যুরা যা কিছু ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আনতো, তা এখানেই রাখতো লুকিয়ে। এই রকম বিবরণ ভূগোল-সংক্রান্ত কিছু কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আমিও দেখে-ছিলাম। আমার মনে হয়, আমার মতো এই নিবন্ধগুলি ফ্রীম্যানেরও চোখে পড়েছিল, নইলে 'সে গুপ্তধনের সন্ধানে অমন পাগলের মতো এখানে খুঁজতে আসবে কেন?

একটি বিশেষ ঝোঁক যখন চাপে, তখন মানুষ বোধহয় এমনি

করেই দিশা হারিয়ে উন্মত্তের মতো হয়ে ওঠে। ব্রীম্যান যেমন গুপ্তধনের ঝোঁকে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এমনি আমিও দিশেহারা হয়ে পড়লাম একটি নারীকে কেন্দ্র করে। সে-রাত্রে স্কোয়ার পর্যন্ত আমরা হেঁটে আসছিলাম। ও বললে, আর এসো না, আমি একা যেতে পারবো।

কাল যাবো তোমার বাড়ি ?

ও তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলো, না। আমার আশেপাশে সব ইয়োবোপীয়ন। তুমি এলে কানাকানি শুরু হয়ে যাবে। সে বড়ো কেলেঙ্কারী ব্যাপার। স্কোয়ারে এসো।

দূর।

দূব কেন ?

বললাম, বেশ ছিলাম। তুমি আমাকে পাগল করে দিয়েছো। এবার আমি কী করবো—

অল্প একটু হেসে উঠলো, পাগল করার ক্ষমতা আমার তাহলে আছে বলো ?

নিশ্চয়ই ! ওর একটি হাত ধ'রে গাঢ় কণ্ঠে বললাম, ভিক্ষে চাইবো একটা জিনিস ?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল, বললে-না না-আর কেন ? ওপন্ ষ্ট্রীট !

বললাম, লোক কই রাস্তায় ? তাছাড়া, নো-বডি কেয়ারস্ !

ও তর্জনী তুলে শাসনের ভঙ্গিতে বললে,—ডোণ্ট ফরগেট, ইউ আর কিসিং অ্যান ইয়োরোপীয়ান লেডি !

বেগ টু ডিফার। তুমিও আমার মতো কলকাতার সন্তান।

একটা সূক্ষ্ম হাসির লহর তুলে ও বললে, কিন্তু সে-কথা কেউ জানে না। আচ্ছা, গুড নাইট !

সত্যি কথা বলতে কী, আমায় মতো কাজ-পাগল লোকও পরদিন কাজ করতে করতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম, কাজেও ভুল

হচ্ছিল। হেড ক্লার্ক এসে আবার বললে, স্যার, আলদাব্রাদ্বীপে লোক পাঠাবার—

বাধা দিয়ে রুক্ষ গলায় বলে উঠলাম, আমাকে দু-চারদিন ভাবতে দিন!

ঘড়ির কাঁটা সেদিন যেন আর একটুও এগোতে চাইছিল না। পাঁচটা বাজতে-না-বাজতেই গর্ডন স্কোয়ারে গিয়ে হাজির হলাম, কিন্তু কোথায় মেরী? এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও ওকে দেখতে পেলাম না। স্কোয়ারে ঢুকে বৃথাই পায়চারী করলাম, আধঘণ্টা এক ঘণ্টা কেটে গেল, মেরীর দেখা নেই।

আমার তখন প্রায় উন্মাদের মতো অবস্থা। স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে সোজা ওর বাড়ির দিকে চললাম। এখানকার অভিজাত-পল্লী বলা যায়। মাথায় টালি বসানো একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটা যে না-চিনতাম এমন নয়, কিন্তু কাছাকাছি গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। ভিতরে আলো জ্বললে বাইরে থেকে দেখা যায়। এ অঞ্চলটায় বৈদ্যুতিক আলো আছে, কিন্তু ওদের বাড়িটা নিঝুম, অন্ধকার।

মনে পড়লো, ও বলেছিল, কখনো আমার বাড়িতে এসো না, লোকে দেখবে আর কানাকানি করবে।. অনতিদূরে তাই দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ, কিছুক্ষণ। তারপরে জোর করে নিজেকে সরিয়ে আনলাম। দ্রুত চলতে লাগলাম বিপরীত দিকে। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে গাড়ির স্ট্যাণ্ডে। একটি মাত্র গাড়ি তখন ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেটি নিয়ে একেবারে সোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার বাংলো।

বারান্দায় আলো জ্বলছিল। গেট থেকে, বারান্দায় পৌঁছানো মাত্রই, চেয়ার গুলোর কাছ থেকে কে যেন উঠে দাঁড়ালো। চকিতে ফিরে তাকালাম। না। যাকে অধীর হয়ে খুঁজছিলাম, সে নয়, ডক্টর টমাস। ডক্টর বললেন, অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি।

বললাম, বসুন। কেমন আছেন? চা-টা—

বললেন, সে সব হয়ে গেছে। তোমার মেড-সার্ভেন্ট—

ডাকলাম, লয়া লয়া ?

যথারীতি দরজার কাছে লয়ার আবির্ভাব। বললাম, আর একটু চা দিয়ে যা।

ও যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো? তেমনি জড়োসড়ো ভঙ্গি। যেন মনে হলো, কিছু বলতে চায়।

কী ?

স্যার

বলতে গিয়ে আবার থমকে থেমে গেল।

বললাম, বাড়তি চা-টা নেই নাকি ?

মাথা নত করে জানাল, আছে।

একটু জোর দিয়ে আদেশের সুরে বললাম, যা কর গিয়ে। পরে শুনবো তোর কথা।

লয়া অদৃশ্য হলো। টমাসের দিকে ফিরে বললাম, ইয়েস ডক্টর ?

বললেন, খুব ঘুরে বেড়াচ্ছি, বুঝলেন ? তথ্য পাচ্ছি অনেক। কিং প্রেম-পে এখানে এসেও কিন্তু স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন তাঁর হারেমে।

বললাম, এ আবার কীরকম নির্বাসন ? হারেম-টারেম শুদ্ধ ?

টমাস বললে, ইংরেজদের এসব আদব-কায়দা খুব। নির্বাসিত করেছিল বটে, কিন্তু রাজার মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ণ করেনি। তিনি তাঁর কিছু বিশ্বস্ত পার্শ্বচর, তাঁর স্ত্রী-বাহিনী, সবই এনেছিলেন, আবার এখানকার সুন্দরীদেরও বঞ্চিত করেন নি।

বললাম, আশান্তিদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন, শুনি ?

বললেন, আশান্তিরা বীরের জাত, মিঃ সানিয়েল। ওরা চাষবাস কিছু করতো না, মানুষ ধরে ধরে এনে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিতো। তাছাড়া, সর্দারে-সর্দারে লড়াই তো লেগেই ছিল। একটা সোনার পিঁড়ি ওদের শ্রেষ্ঠ রাজার প্রতীক। ইংরেজরা দেশ দখল করবার পর ঐ সোনার পিঁড়ি ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এই নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল। সোনার পিঁড়ি

লুকিয়ে ফেলে। আট্‌চেরি বোয়াণ্ডার কথা আগেই বলেছি। তাকে আশান্তির রাজা করে অন্য দাবিদার প্রেম-পে-কে ইংরেজরা পাঠায় নির্বাসনে। রাজা এই সিচেলাসে বহাল তবিয়তেই ছিলেন। বেশ কয়েকবছর কেটে যায়, তারপর আশান্তিতে রাস্তা তৈরি করার সময় মাটি কাটতে গিয়ে হঠাৎ সেই সোনার পিঁড়ি খুঁজে পাওয়া যায়। আবার গোলমাল। আশান্তির লোকজন আট্‌চেরি বোয়াণ্ডাকে চায় না, তার চায় প্রেম-পে-কে। এই আন্দোলন বহুদিন ধরে চলে। শেষ পর্যন্ত সোনার পিঁড়ি ফিরিয়ে দেয় ইংরেজরা। প্রেম-পে-কেও ফিরিয়ে নিয়ে এসে রাজার আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়।

টমাস অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন। দ্বীপে সেদিন প্রেম-পে-ও নেই, তাঁর স্ত্রীরাও নেই, কিন্তু স্থানীয় স্ত্রীদের সন্তান-সন্ততি গেল কোথায়? টমাস বললেন, আমি তাদের নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবো।

বললাম, ডক্টর, এই দ্বীপে হঠাৎ এক জাতীয়তার স্রোত বইতে শুরু করেছে। কার দেহে কোন্ জাতির রক্ত বইছে, এই নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছে। এই জাতীয়তাবাদ যদি উগ্র আকার ধারণ করে, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে না কি? সেখানে শাসকগোষ্ঠী 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতি গ্রহণ করতে পারে। তার ফল কি ভালো হবে?

টমাসের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, একটু থেমে তারপরে বললেন, প্রশ্নটা শক্ত। চট্ করে উত্তর দিতে পারবো না। ভেবে দেখতে হবে।

তারপর আমরা অন্য আলোচনায় চলে গেলাম। মরিসাস-দ্বীপের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা উঠলো, তার ঢেউ যে সিচেলাসে এসে পড়েছে, সেটাকে অস্বীকার করা চলে না। সিচেলাস কি স্বাধীনতা পাবে?

পাবেই! টমাস হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সারা এশিয়া আফ্রিকা স্বাধীনতা পাবে। ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আমাদের চোখ খুলে গেছে।

বললাম, ডক্টর, স্বাধীনতাই বিশেষ কথা নয়। আমাদের দেশের স্বাধীনতায় আমাদের সাধারণ লোকের উপকার হয়েছে কতটুকু? আমি তো দেখছি আমাদের দেশে একটা নতুন রুলিং ক্লাশ গজিয়ে উঠেছে মাত্র।

টমাস বললেন, এখানেও হয়ে উঠবে। উগ্র জাতীয়তাবোধের থেকে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এসবই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ, তারপরে আসবে প্রবল একটা ঢেউ। সব একাকার হয়ে যাবে। হিস্টোরিয়ান হিসাবে আমি এই পর্যন্তই বুঝতে পারছি।

আরও নানা কথার পর টমাস বিদায় নিলেন। রাত তখন সাড়ে আটটা। ওঁর হাতে নিজের টর্চ ছিল, সেটা জ্বালিয়ে উনি সংক্ষিপ্ত উচুঁ-নিচু পায়ে-চলা পথটা ধরে শহরের দিকে ফিরে গেলেন।

আমি বসবার ঘরে এলাম। একটা আলো জ্বলছে, ঘরে কেউ সেই, লয়াকে ডাকতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম শোবার ঘরে। ইজিচেয়ারের কাছে আলোটা জ্বলছে। এগিয়ে যেতেই হঠাৎ কানে এলো, অতিথি চলে গেল?

চমকে বিছানার দিকে ফিরতেই অবাক হয়ে গেলাম। আমার বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে সে। সেই ভায়োলেট্ গাউনটা পরা, মাথার চুল খোলা।

মেরী!

ও উঠে বসলো, তুমি যখন এলে, আমি তখন তোমার বসবার ঘরে। লয়া বলতে গেলে আমার কথা, তুমি ওকে ধমকে চা করতে আদেশ দিলে। তারপর শুরু হল তোমাদের বকবকানি। কী আর করি? কতক্ষণ আর বসে থাকি? তোমার বিছানায় এসে সটান শুয়ে পড়লাম।

ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললাম, উঠলে কেন? থাকোনা শুয়ে?

মুখ টিপে হাসলো, তারপরে আর বাক্যব্যয় না করে পা উঠিয়ে যেমন শুয়েছিল, তেমনি শুয়ে পড়লো। সেজ-বাতির স্নেহ আলোর

ছটা ওর মুখের পাশ দিয়ে এসে ওর বক্ষচূড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তার-পরে আবছা আলোর মায়া।

আমাকে আত্মবিস্মৃতের মতো এগিয়ে যেতে দেখে একটা হাত আমার বুকে ঠেকিয়ে আমাকে রোধ করলো, বললো, চান করবে না? যাও চান করে এসো। তোমার বাথরুমে লয়া সব সাজিয়ে রেখে এসেছে, তোমার পায়জামা, তোমার ড্রেসিং-গাউন, সব।

একটু ক্ষুব্ধ হলাম মনে মনে। বললাম, আচ্ছা, আসছি।

স্নান করতে বেশিক্ষণ লাগলো না। সব সেরে ঘরে এসে দেখি, বিছানায় ও নেই। পর্দা সরিয়ে বসবার ঘরে এলাম। আলাদা ডাইনিং স্পেস থাকিলেও রাত্রে আমি এখানে বসেই খাই। দেখি টেবিল সাজিয়ে খাবার-টাবার দেওয়া হয়ে গেছে। মেরী টেবিলের একধারে বসে লয়াকে কী সব নির্দেশ দিচ্ছে।

আমাকে দেখেই মেরী বলে উঠলো, শীগ্‌গির বসে পড়ো। আমারও ভীষণ খিদে পেয়েছে। কী, কাল না ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলে?

বসে পড়ে বললাম, এমনি নিমন্ত্রণ রোজ যদি গ্রহণ করো, তো, সত্যিই খুব খুশি হবো।

থাক। আর বকবকানি নয়! তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

এ-পর্ব শেষ হবার পর যখন সুস্থির হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, মেরী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, বললে, আর দেরি নয়, চলো, পৌঁছে দেবে।

মানে!

মেরী গতকালের মতোই এগিয়ে এসে দু-হাতে গলা জড়িয়ে—

সারা শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো, তারপরে সরে গেল একেবারে দরজার কাছে, বললে, বেশ রাত হয়ে গেছে। কী ভাববে আমায় পাড়ার লোকেরা? শীগ্‌গির চলো।

সে-রাত্রে প্রায় ওর বাড়ির কাছ পর্যন্ত যেতে হলো বললাম, কাল।

মেরী মুখ চেপে হাসলো, বললো, বলতে পারছি না!

বলে, ছুটে চলে গেল ওর বাড়ির ভিতরে।

পরদিন অফিসের পর 'মরিস'-গাড়িটা নিয়ে সোজা চলে এলাম বাড়িতে। কিন্তু কোথায় মেরী? বসবার ঘর, শোবার ঘর, এমন কি লযার রান্নাঘর, কোথাও সে নেই। লয়া ভয়-ভয়-করা সন্ত্রস্ত চোখে আমার দিকে একবার তাকালো। আমি স্নানেব শেষে আবাবও তাকে খুঁজলাম কিন্তু সে আসে নি।

দেখা হলো তার পরদিন, বাড়িতেই। এসে দেখি, বসবার ঘরে বসে আছে থমথমে মুখে। বললো, কাল গর্ডন স্কোয়ারে কতক্ষণ বসে রইলাম, তুমি এলে না।

বললাম, আর আমি বাড়িতে এসে খালি এ-ঘর ও-ঘর করেছি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বাড়িতে আসবে।

কথা বলছি, এর মধ্যে মুবু এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালো, তেমনি হাসি-হাসি মুখ। বললে, প্রিন্স?

বললাম, এসেছো ফিরে? এসো, আলাপ করিয়ে দেই।

মুবু বললো, ম্যাডামের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছি স্যার।

মেরী বললে, নাইস ছেলে। ওর কাছ থেকে মুক্তো ধরার গল্প শুনছিলাম।

সত্যি?

মুবু একটু উৎসাহিত হয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে, স্যার, আমি গতকাল ডুবুরীর পোশাক পরে সমুদ্রে নেমেছিলাম। ভয়েব কিছু নেই, খুব সহজ ব্যাপার। আর যা আমি দেখলাম, তা চিরকাল মনে থাকবে।

বলতে বলতে ও কার্পেটের ওপর বসে পড়লো। আমার শোবার আগ্রহ যে ছিল না এমন নয়, কিন্তু মেরী যেখানে সামনে বসে, সেখানে, তুলনায় ওর আকর্ষণ কতটুকু? আমার চোখে-মুখে একটা অস্বস্তিই ফুটে উঠলো।

মেরী ব্যাপারটা বুঝলো। বুঝে, মুখ চেপে একটু হাসলো। তারপরে, আমার মনে জ্বালা ধরাবার জন্যই বোধহয়, মুবুর দিকে

ঝুঁকে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলো, তারপরে মুবু? তারপরে?

মুবুকে তখন আর পায় কে? সে উৎসাহিত হয়ে হাত নেড়ে চোখ বড়ো বড়ো করে ওর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে শুরু করলো, ঝিনুকে মুক্তো হয় কী করে, জানেন? ওরা সব ঝিনুক তুললো ঝুড়ি বোঝাই করে। সব জ্যান্ত ঝিনুক। বাইরে ঐরকম শক্ত, কিন্তু ভিতরটা একেবারে তুলতুলে নরম। গোটা কয়েক আবার মরে গেল কিনা, তাই দেখলাম। ওরা করলো কী, জ্যান্ত ঝিনুকের জোড়া খোল দুটির মুখ কোনরকমে ফাঁক করে বালির কণা ঢুকিয়ে দিতে লাগলো। এ গেল প্রথম দিনের কথা। তারপরে গতকাল আবার গেলুম আমরা 'সায়া-দি-মাল্‌হা-ব্যাঙ্ক'-এ।

সেটা আবার কী?

মেরী বললে, সমুদ্রের একটা খাড়ি। তুমি বলে যাও মুবু। তারপর?

মুবু বললে, সেই সব ঝিনুক আবার সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল। এক বছর পরে আবার ওগুলোকে তুলে আনা হবে। তখন ওতে পাওয়া যাবে মুক্তো। মাই গড! কীভাবে মুক্তো হয় জানেন? সর্দার ডুবুরীটার কাছ থেকে সব শুনে এলাম। আমাদের চোখের মধ্যে বালির কণা ঢুকলে কীরকম যন্ত্রণা হয় বলুন তো? ঝিনুকেরও সেইরকম যন্ত্রণা হয়। আমরা যেমন অনেক চেষ্টার পর চোখ থেকে বালির কণা বার করে নিতে পারি, ওরা তা পরে না। ক্রমাগত যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ওদের ঐ নিদারুণ ব্যথা একটা রূপ পায়। সেই অসহ্য ব্যথাই ধীরে ধীরে মুক্তো হয়ে ফুটে ওঠে। ওদের যা 'ব্যথা', আমাদের কাছে তা 'মুক্তো'।

বলতে-বলতে অদ্ভুত কাণ্ড, মুবুর চোখদুটো ছলছল করে উঠলো। আর সেই মুহূর্তেই হঠাৎ আমার চোখ পড়লো, দরজার কাছে আত্মবিস্মৃতের মতো দাঁড়িয়ে আছে লয়া, যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে মুবুর বর্ণনা শুনছে।

ঘরের আবহাওয়াটা হঠাৎ কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল।

আমরা সবাই চুপ করে আছি। শুধু বাইরে, নারিকেল-বীথির ওপরে দক্ষিণের হাওয়া এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাচ্ছে!

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর, অস্বস্তির ভাবটা দূর করবার জন্য আমি বলে উঠলাম, দেশে আমার মার কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম। মা বলতেন, সমুদ্রে শুক্তির মধ্যে মুক্তো কখন জন্মায় জানিস? যখন আকশ থেকে স্বাতী নক্ষত্রের জল এসে পড়ে।

মেরী অস্ফুট কণ্ঠে বললে, স্বাতী নক্ষত্র?

হ্যাঁ।

মেরী বললো, স্বাতী আমাদের কাছে বেদনার প্রতীক, জানো তো? হৃদয়-মথিত করা চোখের জলে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপরে, ওকে ডেকে নিয়ে এলাম আমার শোবার ঘরে। একটা বিষণ্ণ, ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছে মেরীর মুখে। ও আমার পাশ ঘেঁষে বসলো বটে, কিন্তু মনটা যেন কোথায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে!

ধীরে ধীরে এক সময় বলতে লাগলো, এতদিনে ও লণ্ডনে পৌঁছেছে, কী বলো?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও বললে, বেশিদিন থাকতে পারবে না, কাজ সেরেই ও চলে আসবে, দেখো? লণ্ডন থেকে মালাগাসী আকাশপথে মাত্র একদিন। মালাগাসী থেকে এখানে আসতে, জাহাজে ধরো দেড় দিন। মোট আড়াই দিন, তাই না?

বললাম, দেখো মেরী, আমি ঠিক—

বাধা দিয়ে ও বললে, আমি বোধহয় নিজেকেই ঠিক চিনতে পারছি না। ওকে ভালবাসি? ঠিক জানি না। আমার ভাগ্য ওকে আমার জীবনের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। আমি যেন শুক্তি, ও যেন এক কণা বালি। ওকে জীবন থেকে ঠেলে দেবো, এমন সাধ্য আমার নেই! সারা জীবনের জন্য একটা প্রবল আশাকে

আমি আমার সত্তায় টেনে নিয়েছি।

বলতে বলতে শেষের দিকে গলাটা ধ'রে এলো মেরীর, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আবহাওয়াটা আবার থমথমে হয়ে গেছে। এরপর বহুক্ষণ আমরা কেউ কথা বলতে পারিনি মনে আছে। নীরবে খাবার টেবিলে উঠে গিয়ে সে পালা শেষ করে আবার আমরা শোবার ঘরে এলাম।

বসো, বলে বিছানাটা দেখিয়ে দিলাম।

ও বসলো। আমার দিকে তাকালো পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। বললো, আচ্ছা, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

এম্‌নি।

মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছো নিশ্চয়।

এ যাবৎ মিশিনি, তবে সম্প্রতি মিশছি।

মানে!

বুঝতে পারছো না? তুমি সেই মেয়ে, যার সঙ্গে মিশছি ঘনিষ্ঠভাবে।

আহা! বলে মুখখানা ঘুরিয়ে নিলো মেরী, বললো, তোমার মুবু লোকটা কিন্তু বেশ।

বেশ ছিল। কিন্তু আজকাল ওদের বস্তিতে ওদের জাতের এক পুরুতের সঙ্গে মিশে যত সব পুরোনো সংস্কার শিখতে আরম্ভ করেছে।

তা শিখুক। তোমার কী?

আমার আর কী! আমি বাউণ্ডুলে মানুষ, আমার কোনো কিছুতেই যায়-আসে না।

আর তোমার লয়া?

লয়া? ঐ চাকরাণীটা? ভীষণ ভীতু আর লাজুক, সাত চড়ে রা কাড়ে না।

চড়-চাপড় দাও বুঝি?

আমি না। ঐ মুবু।

কেন ?

সে ওরাই জানে।

মেরী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপরে বললে, ওরা দুজনেই কি নিগ্রো ?

হ্যাঁ।

দেখে তো মনে হয় না।

কিন্তু ওরা বলে, ওদের শিরায়-উপশিরায় আফ্রিকার আদিবাসীদের রক্ত বইছে !

মেরী একটুক্ষণ থেমে থেমে তারপরে বলে, তোমার লোভ হয় না ?

অবাক হয়ে বললাম, কীসের !

কিসের আবার ! লোভ হয়না লয়ার শরীরের ওপর ?

ছিঃ।

ছিঃ কেন ! বেশ ত দেখতে !

গম্ভীর হয়ে গেলাম। বললাম, আমাকে অতোটা নীচ ভাবলে তুমি ? আর তাছাড়া—

তাছাড়া ? কী ?

বললাম, আমার কেমন যেন মনে হয়, মেয়েটা ভিতরে ভিতরে মুবুকে ভীষণ ভালোবাসে। যেমন ও মুখ বুজে মুবুর চড়-চাপড় সহ্য করে, তাতে মনে হয়—

ও বাধা দিয়ে ফিসফিস করা গলায় বললে, চড় চাপড় তো আমিও সহ্য করি আমার স্বামীর, কিন্তু তাতে কি এই বোঝায়, তাকে আমি ভীষণ ভালবাসি ?

ভালোবাসো না ! তুমিই তো বললে, তাকে কোনোদিন ছাড়তে পারবে না।

ও আরও গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, আমার জন্য নয়। আমার মায়ের জন্য আমার—বাবার জন্য। ও ভীষণ অভিজাত ঘরের ছেলে, ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে লণ্ডনের সমাজে তাঁরাও জাতে উঠেছেন,

এখন আমাকে নিয়ে কোনো স্ক্যাণ্ডাল হলে, তাদের অবস্থা কী হবে বলো তো ?

কী আবার হবে ? দেশে, অর্থাৎ ভারতে ফিরে আসবেন।

মেরী মুখ নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলো। তারপরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলে উঠলো, কথাটা আমিও এক সময়ে খুব ভেবেছি। ভেবেছি, এইভাবে ওদের আঘাত দেবো প্রচণ্ড আঘাত। আঘাত দিয়ে ওদের ফিরে যেতে বাধ্য করবো দেশে। কিন্তু পরে চিন্তা কবে দেখলাম, সেটা সম্ভব নয়। দেশেও ও'দেরকে নিজের বলে ভাববাব কেউ নেই। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে তোমরা কি ভাবতে পারো নিজেদেব আত্মীয় বলে ?

বললাম, আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি দেশছাড়া, জাত-ছাড়া, গোত্র-ছাড়া।

ফিরবে তো একদিন দেশে ?

বোধ হয় না।

ও মুখ টিপে একটু হাসলো, তারপরে বললো, অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছো কেন ? বসতে পারোনা পাশে ?

বসলাম। ও আমার দিকে ফিরলো। বিস্তৃততর হলো ওর অধরের হাসি, বললো,সত্যি বলো ত, কতখানি ভালোবেসেছো আমাকে ?

আমি উত্তর না দিয়ে ওকে দু-হাতে টেনে নিলাম বুকেব কাছে। এবং দেখলাম, আমার প্রমত্ততায় ও বাধা দিলো না। বরং শরীরটাকে শিথিল করে দিয়ে বিছানার ওপর লুটিয়ে দিলো নিজেকে। তারপরে দুটি হাত দিয়ে আমার গলাটা বেষ্টন করে ধরে আমাকে নিবিড় করে আকর্ষণ করলো বুকের কাছে। আমি উন্মত্তের মতো বলতে লাগলাম, আজ তুমি যেওনা—যেওনা বাড়ি ফিরে।

না ফিরে গেলে খুশি হও ?

হ্যাঁ।

আর কিছু বললো না। আর কিছু বলাবলির অবকাশও

ছিল না। ঘর খোলা রইলো, বাতিটা জ্বলতে লাগলো, আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। একটা ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো মাংসখণ্ড নিয়ে প্রমত্ত হয়ে রইলাম।

অনেক, অনেক পরে, ঝড়টা থেমে যাবার পর যখন শ্রান্তিতে মাথা এলিয়ে দিযেছি একপাশে, তখন মৃদু, অস্পষ্ট গলায় ও বললো, এবার যেতে দাও?

একটি হাত ওব বুকের ওপব উঠিয়ে দিয়ে ছেলেমানুযেব মতো আবদার করলাম, না, যেও না।

ও আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলো। এইভাবে আমাকে শান্ত করে একসময় ও উঠে বসলো। তারপরে নিজেকে বিন্যস্ত কবতে করতে বললো, না ফিবলে আমার চলবে না। যাবে এগিয়ে দিতে? না, মুমুকে সঙ্গে নিয়ে যাবো?

অগত্যা উঠলাম। বললাম, না। আমিই যাচ্ছি।

আমার দিকে তাকালো পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, বললো, দেশে ফিরে যাও।

বললাম, তুমি যদি যাও তো সত্যিই ফিরে যাবো।

ঠিক!

ঠিক।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললে, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

ফ্রীম্যানের কী হবে?

সেটাই তো ভাবছি।

উঠে দাঁড়ালো। একটা টর্চ হাতে নিয়ে ওকে এগিয়ে দিতে চললাম। স্কোয়ারটা পেরিয়ে ওদের পাড়ার দিকে যেতে যেতে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও বললো মৃদু, স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে, খুশি হয়েছো?

একটা বড়ো শিরীষ গাছের তলায় আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওর একখানা হাত হাতের মধ্যে নিয়ে এসে বললাম, 'অল্ মাই বডি অ্যাণ্ড সোল্ বার্নিং ইন লভ ফর ইউ!'

অল্প একটু হাসলো, উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো চোখদুটি, আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, নট্ সোল, সে বডি। আচ্ছা, গুডনাইট।

বলে তাড়াতাড়ি আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেল বাড়িব দিকে। শিরীষ গাছেব ছায়ায় আমরা ছিলাম, পথও ছিল একেবারে নির্জন। বিদায়-বেলায় আমি ওর কাছে একটা কিছুব প্রত্যাশায় ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়েছিলাম বুঝি। ও এমন করে দ্রুত পায়ে চলে যেতেই বুকেব ভিতরটা মুহূর্তের জন্য যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

চিত্রার্পিতেব মতো দাঁড়িয়ে ওর চলে-যাওয়ার ব্যাপারটা স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ও যখন ফুটপাথ ধরে আরও অনেকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা পার হয়ে ওর বাড়ির গেটের দিকে গেল, তখন দেখি ঠিক পাশের বাড়ির দরজা থেকে কে একজন বেরিয়ে ওর কাছে গেল। কী একটা কথা বললো। উত্তরে মেরী মাথা নেড়ে ছোট্ট করে কী যেন বলে তৎক্ষণাৎ গেট খুলে প্রায় ছুটেই বাড়ির ভিতরে চলে গেল। আর সেই লোকটা ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ফিরে এলো তার বাড়ির দরজায়।

আমি ততক্ষণে কয়েক পা পিছিয়ে বৃহৎ শিরীষ গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়েছি। বলা বাহুল্য, অদ্ভুত একটা সন্দেহ আমার মনটাকে তখন জড়িয়ে ফেলেছে। রাস্তা একেবারে নির্জন। এই এতক্ষণ পরে একটি লোক টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল।

আর সে চলে যাবার পরেই, সেই পাশের বাড়ির লোকটা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আবার বেরিয়ে এলো। পাশের বাড়ির গেট খুললো, তারপরে ভিতরের লনে ঢুকে গেটটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল বাড়ির ভিতরে। আর কিছু দেখা গেল না। ওপরের ঘরে একটা আলো জ্বলছে, জানালার ঘষা কাচের বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, আলো-জ্বালার সংকেতকে অনুভব করা যায় শুধু।

সে-রাতটা আমার যে কীভাবে কেটেছিল তার বর্ণনা না করলেও চলে। পরের দিন সকালে যখন উঠলাম, তখন শরীর-মন অনেক ঝরঝরে। শুধু লক্ষ্য করলাম, মুবুর মুখখানা যেন কেমন অস্বাভাবিক থমথমে, কী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। আরও লক্ষ্য করলাম, অফিসে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত লয়া আমার সামনে এলো না।

অফিসে আবার আলদাব্রা দ্বীপে যাবার কথা উঠলো। কিন্তু কাকে পাঠাই? সেদিনও মনস্থির করে উঠতে পারলাম না। অফিসের সেই মরিস গাড়িটা করে সোজা বাড়ি চলে এলাম। বসবাস ঘরে বসে চেঁচিয়ে ডাকলাম, লয়া-লয়া?

কিন্তু লয়া সামনে এলো না, তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়ালো মুবু। বললাম, চা দে।

চা-পর্বের পর মুবুকে কাছে ডাকলাম। বললাম, কী হয়েছে রে, তোর?

ওর মুখখানা একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, কেমন যেন আমতা করে বললে কই, কিছু না তো।

ওর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, লয়াকে ডাকতো?

ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

গলায় একটু জোর এনে বলে উঠলাম, লয়া আসছে না কেন, আমার সামনে? কী হয়েছে?

মুখ নীচু করে মুবু উত্তর দিলে, লয়া নেই, প্রিন্স।

চমকে উঠলাম, নেই! নেই কী রে?

মুবু একটু ইতস্তত করে তারপরে বললো, মানে এখানে নেই।

কেন!

প্রিন্স! বলতে বলতে ওর মধ্যেকার অব্যক্ত উত্তেজনাটা ছড়িয়ে পড়লো, বললো, আপনাকে আগেই বলেছি, ওদের পায়ের নিচে রাখতে হয়, লাই দিতে নেই! কাল জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল

আপনাদের ঘরে। এতো বড়ো সাহস ? আমি ওর ঘাড় ধরে মুখ চেপে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে এসে বেদম মার মেরেছি। মাথার কাছটা কেটে গেছে, হাঁটুতে চোট লেগেছে, হাঁটতে পারছে না। কিন্তু এমন মেয়েছেলে, একটু টুঁ শব্দ করেনি. পড়ে পড়ে সারা শরীরে লাঠির বাড়ি খেয়েছে।

আমি যেন নিশ্বাস রোধ করে ওর কথা শুনছিলাম। ও বলে চলেছে. আমার রাগ কমে আসার পর ওর পড়ে থাকা নিশ্চল শরীরটার দিকে তাকিয়ে আমার প্রথমটায় মনে হয়েছিল. বুঝি মবে গেছে ! ওর জামা-টামা সব আমি ছিঁড়ে দিয়েছিলুম। আপনারা বেরিযে যাবার পব আমি ওকে একটা বড়ো তোয়ালে চাপা দিয়ে আমাদের পুরুতের কাছে নিয়ে গেলুম। কবর দেবার ব্যবস্থা করতে হবে তো ?

অস্ফুট গলায় বলে উঠলাম, কী আশ্চর্য, আমি একটুও টের পাইনি !

বললে, ও চ্যাঁচালে তো টের পাবেন ! পুরুত ওকে ভালো করে দেখে বললে, মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গেছে। মাথার একটা পাশে রক্ত জমা হয়ে গেছে। আমি প্রথমটায় দেখতে পাইনি, পুরুতের কথায় তাকিয়ে দেখি, আমার জামা-কাপড়েও রক্তের ছাপ। পুরুত কী সব শেকড়-বাকড় খুঁজে এনে থেৎলে ওর মাথায় লাগিয়ে দিয়ে পট্টি বেধে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হলো, কিন্তু হাঁটুটা নীল হয়ে ফুলে আছে। আমি ওকে পুরুতের হেফাজতে রেখে বাড়ি ফিরে এলাম। কী জানি, যদি আপনি আমার খোঁজটোজ করেন।

করেছো কী !—উত্তেজনায় ভিতরটা থরথর করে কাঁপছিল। কোনক্রমে নিজেকে সামলাতে সামলাতে উঠে দাঁড়ালাম, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে বলে উঠলাম, চলো আমার সঙ্গে।

কোথায় !

লয়া যেখানে আছে, সেখানে।

মুবু অবাক হয়ে বললে, অফিসে যাবেন না ?

যাবো পরে। চলো।

আমার 'চলো' সম্বোধনটা ও লক্ষ্য করলো। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অফিসের মরিস গাড়ি, যেটা আমাকে নেবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটিতে উঠে মুবুকে নিয়ে চলে এলাম বেল-অম্বি্তে।

প্রথমেই সেই নির্বাক ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা 'দমদম রক্'টা চোখে পড়লো। বিরাট বিরাট গর্ত খুঁড়েছিল ওখানে, মেরীর স্বামী, ফ্রীম্যান। লোকটা গুপ্তধনের খোঁজে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে জলের মতো খরচ করেছে। ফিরে এসে হয়তো আরো পয়সা ঢালবে!

আর ওদিকে ওর স্ত্রী—

থাক। তার কথা আর না ভাবাই ভালো। আমি পাহাড়টা থেকে মুখ ফিরিয়ে মুবুর সঙ্গে চলতে লাগলাম। ওদের বস্তির রাস্তা এত সরু যে ছোট মরিস গাড়ির পক্ষেও তার ভিতরে ঢুকতে পারা সহজ নয়। তার ওপরে রাস্তার যেটুকু পরিসর, তার মধ্যে মুর্গি ঘুরছে বাচ্চা নিয়ে, কেউ বা দেওয়াল ঘেঁষে উনুন তৈরি করে তাতে রান্না-বান্নারও কাজ করছে। অনেক ঘরের সামনেই আবার চৌ-পায়ে পাতা রাস্তাটাই ওদের উঠোনের কাজ করছে যেন। কতকগুলির ছোট ছোট পাকা দেওয়াল-গাঁথা খুপরী, মাথায় পুরোনো টালি বসানো সামনে-পিছনে ঢাল করে। আবার কতকগুলির মাথা খড়ের মতো এক ধরণের পাকা শন দিয়ে ছাওয়া, কিম্বা শুকনো নারকেল পাতায়। কতকগুলির দেওয়াল মাটির, চুন দিয়ে লেপা।

এমনি একটা পাতা-ছাওয়া মাটির দেওয়ালের খুপরিতে আমরা ঢুকলাম। আমাদের দেখে চমকে উঠলো লয়া, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাড়া-তাড়ি বিছানা থেড়ে উঠতে গেল। আমি ধমকে বললাম, উঠোনা, শুয়ে থাকো।

লয়া আমার কথা শুনলো না, উঠে বসলো। আর উঠতে যে কষ্ট হলো, সেটা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। মাথায় পট্টি বাঁধা

ডান হাঁটুতেও একটা পট্টি, আর সারা মুখখানা বিবর্ণ, যেন কেউ রক্ত শুষে নিয়েছে !

এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে বললাম, তোমাদেব পুরুত কোথায় ?

বেরিয়ে গেছে।

মুবুকে বললাম, ওকে ধরাধরি করে আমার গাড়িতে তোলো। হাসপাতালে নিয়ে যাবো।

কিন্তু হাসপাতালের নাম শুনে লয়া কাঁদতে লাগলো। চেঁচিয়ে কান্না নয়, নীরব অশ্রু। মুবু ধমকে উঠলো, সাহেবের মুখের ওপর কথা। চলো হাসপাতালে !

'হাসপাতাল'-এর নামে যে এরা ভীষণ ভয় পায়, তা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে লয়া বললো অন্য কথা। আব অমন কাতর হয়ে এতো কথা যে একসঙ্গে লয়া বলতে পারবে, তা আমি আগে ভাবতেও পারি নি। ও বলতে লাগলো, হাসপাতালে আমাকে দয়া কবে পাঠাবেন না। ওখানে গেলেই ডাক্তার সাহেব নানান কথা জিজ্ঞাসা করবেন। হয়তো তখন ওর জেরায় আমি থতমত খেয়ে সত্যি কথা বলে ফেলবো তাতে করে যদি পুলিশ-টুলিশ আসে, যদি ওর কোনো ক্ষতি হয় !...

যে মেয়ে আমার সামনে কখনো মুখ তোলে না, কখনো একটার বেশি দুটো কথা বলেনা, সে-মেয়ে যেন আজ মরিয়া হয়ে তার কথাগুলো বলে যাচ্ছে !

বলতে বলতে আবার ওর চোখ ভরে এলো জলে। সেদিকে খেয়াল নেই, ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলো, ওর ক্ষতি হবে, ওর ক্ষতি হলে আমি আর বাঁচবো না !

আমি মুবুর দিকে ফিরে তাকালাম। ও লোকটাও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে সেও তাকিয়ে আছে লয়ার মুখের দিকে। আমি বলে উঠলাম, ঠিক আছে, হাসপাতালে যেতে হবে না, আমার বাড়িতে চলো। আমার বাড়িতেই যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। মুবু ওকে তুলে নিয়ে আয়।

বলে, আমি আর দাঁড়ালাম না। এগিয়ে গেলাম গাড়ির দিকে। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, দু-হাতে পাঁজাকোলা করে ধরে ওকে মুবু নিয়ে আসছে। লোকজন, কাচ্চা-বাচ্চার ভিড় হয়ে গেছে চারদিকে।

বলা বাহুল্য, সেদিন বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল অফিস যেতে। মুবুকে দিয়েই ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছিলাম। মুবু ডাক্তার ডাকার পক্ষপাতী ছিল না, তার আগ্রহ ছিল তাদের জাতের পুরুতকে ডাকার। আমি বললাম, সে তো নেই, সে থাকলে না হয় তাকেই ডাকতাম।

ও বললে, লাই দিচ্ছেন প্রিন্স, ও ঠিক মাথায় চড়ে বসবে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে নিচু গলায় বললাম, মুবু প্রিন্স আমি নই, প্রিন্স তুই। তুই ওর ভালোবাসা পেয়েছিস, প্রকৃত ভালোবাসা। ওর ভালো-বাসার জগতে তুই রাজা।

কী আশ্চর্য, এ কথাটা ঠিক করে বুঝতে আমারই বা এতো দেরী হলো কেন? তোর হাতে চড়-চাপড় খেয়েও যখন ও চুপ করে থাকতো, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। নইলে কী এমন মাইনে পায়—করে তো চাকরাণীর কাজ। অন্য জায়গায় অনেক বেশি মাইনেতে ও রাঁধুনীর কাজই করতে পারতো। রান্নাবান্নার কাজ ও বেশ জানে। দেখতিস, ওকে সবাই লুফে নিতো।

মুবু আমার কথাগুলো অবাক-অবাক চোখে শুনে গেল, কিছু বললো না।

ওর গায়ে একটু নাড়া দিয়ে বলেছিলাম, ওকে বিয়ে করবি তুই? ফেল্না বিয়ে করে?

ধুৎ! মুবু বললে, আমি 'কুক', আমি বিয়ে করবো একটা চাকরাণীকে। আমার মান-ইজ্জৎ নেই? কিন্তু আপনি কী বললেন স্যার, আমাকে ও ভালোবাসে। আমি তো কখনো বুঝতে পারিনি!

হেসে বললাম, তাহলে তুই একটা আস্ত গাধা।

ও মুগ্ধ কণ্ঠে বললো, গাধা হই আর যাই হই, ওর ছলাকলায় আমি ভুলছি না। দরকার হলে দেবো লাথি মেরে দূর করে।

বললাম, না বাবু, যথেষ্ট মেরেছো, আর মারধোর করো না।

না স্যার ওদের পায়ের তলায় না রাখলে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, রাখিস পায়ের তলায়, কিন্তু আপাতত কোনো বাগড়া দিস্‌নি. ওকে সেরে উঠতে দে।

ওইসব কথা বলে-টলে ওদের একটু শান্ত করে আমি চলে এসেছিলাম অফিসে। অফিসে আবার সেই আলদাব্রা যাবার তাগিদ। ওখানে বাকি শ্রমিকরা পরস্পরের মধ্যে মারামারি করে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে, অবিলম্বে ওখানে কাউকে না পাঠালেই নয়!

কিন্তু কাকে পাঠানো যায় ?

আমায় হেড-ক্লার্ক বললেন, স্যর, একটা কথা বলবো ? আপনি নিজে না গেলে ওখানকাব ব্যাপার মিটমাট কবতে পারবেন না ?

আমি চুপ করে শুনলাম ওঁর কথা। ভদ্রলোক আবার বললেন, পরশুদিন সকালে জাহাজ ছাড়ছে। বুক করবো কেবিন ?

আলদাব্রায় এখান থেকে মাসে একবার কি ছুবার জাহাজ যায়। প্রায় চার-পাঁচশো মাইল দূর, একটা জাহাজ ধরতে না পারলে আর একটা জাহাজ পাওয়া মুশকিল। তখন মালাগাসী গিয়ে প্লেন ধরে মোম্বাসা হয়ে যেতে হবে, যাকে বলে ঘুরিয়ে নাক দেখানো। বললাম বুক্ তো করুন। নিজে না যাই, কাউকে না কাউকে পাঠাতেই হবে।

অফিস থেকে ফিরে সোজা বাড়ি এলাম। মুবু লয়াকে বাংলোর আউট-হাউসে রেখেছে। 'নিজের ঘর' বলে একটা বস্তু ওর বরাবরই আছে, যদিও সেখানে থাকে খুব কম, আর শোয় তো বাংলোর মধ্যেই।

আমি লয়া-মুবুদের কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, তাই শোবার ঘরে একেবারে আমার বিছানায় মেরীকে দেখে চমকে উঠলাম। সাদার ওপরে বড়ো বড়ো লাল ফুলের প্রিণ্ট তোলা

একটি গাউন বা ফ্রক পরেছে আজ, মাথার চুল 'হর্স'-টেল' করে বাঁধা। মুচকি হেসে বললে, কাল আসতে পারিনি বলে রাগ করছো তো? খবর আছে। টেলিগ্রাম পেলাম আজ লণ্ডন থেকে। ফিরে আসছে প্লেনে। দেখ কাণ্ড! একেবারে একদিন-কি হুদিনের মধ্যেই কাজ মিটে গেলো।

কাজের লোকের পক্ষে একদিন-হুদিনই যথেষ্ট। ও ওমনি মিটি মিটি হাসছিল, বললে, সুতরাং আজ শেষ রাত্রি। নাও, চান-খাওয়া-সেরে নাও।

আমি অভ্যাসবশতই স্নান সেরে নিলাম, ওর সঙ্গে বসে খাওয়াও সারলাম। তারপরে বললাম, চলো মেরী, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অবাক হয়ে বললে, ওমা! এতো সকাল-সকাল।

মুবু কাছাকাছি থাকতে পারে মনে করে শোবার ঘরেই এলাম। ও-ও পিছনে পিছনে এসেই বললে, কী ব্যাপার বলো তো? রাগ কি এখনো পড়ে নি?

ওর চোখের দিকে হু-চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করলাম, মেরী, পরশু রাত্রে আমি সব দেখেছি!

চমকে উঠলো, রুদ্ধকণ্ঠে বললো, কী। কী দেখেছো!

পাশের বাড়ির লোকটি কে?

ও আমার আরো কাছে সরে এলো। মুখোমুখি দাঁড়ালো, তার পরে ধারালো গলায় বলে উঠলো, কী তুমি বলতে চাও?

কিছু বলার অধিকার আমার নেই। শুধু একটু বলবো, আমার কাছে এমন খেলা খেললে কেন তুমি?

হঠাৎ হু-হাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে ফেললো, বললো, তুমিও। তুমিও আমার স্বামীর মতো করে কথা বলবে!

তারপরে একসময় মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে হুটি জ্বালাময় চোখে বললে, খেলাই তো। খেলা ছাড়া আবার কী! তবে এটুকু জেনো, তোমার কাছে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছিলাম শুধু একটি

স্বার্থে। যদি তুমি আমাকে নিয়ে মত্ত হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত জোর করে আমাকে আমার দেশ, ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো! আমার শিশু-বয়সের স্বপ্ন সেই বাংলাদেশ, কলকাতায়! আমি চেষ্টা করেও সে জোর মনের মধ্যে আনতে পারছিলাম না। এখন আমি চাই কেউ আমার উপর জোর খাটাক, আমাকে নিয়ে চলুক অন্তত এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে। এখানে আমি থাকতে চাইনা—চাইনা!

মেরী!

ও তখন পাগলের মতো হয়ে গেছে। বলতে লাগলো, আমার পাশেব বাড়ির যে লোকটিকে তুমি দেখেছো, সে হাউসম্যান। আর কিছু? আর কিছু জানতে চাও?

আমি ওকে স্পর্শ করতে গেলাম, ও ছিটকে সরে গেল দূরে। তীব্র কণ্ঠে, প্রায় চিৎকার করে বললো, খববদাব তুমি আমাকে ছুঁয়ো না! আমাব সব স্বপ্ন চুরমাব করে দিয়েছো তুমি। তোমাকে আমি আর চাই না। সবে যাও আমার কাছ থেকে!

বলা বাহুল্য সরেই এসেছিলাম। সরে এসেছিলাম একেবারে ছ'শো তিরিশ মাইল পশ্চিমে আলদাব্রা দ্বীপে। এতো পথ জাহাজে এসেছি, কিন্তু সমুদ্র ছিল আগাগোড়া শান্ত, দিগন্তে এক টুকরো কালো মেঘের চিহ্নও দেখতে পাইনি। জাহাজের কাপ্তান ছিলেন গুজরাতী, মিঃ রাণা। তিনি বললেন, এই সময় সমুদ্র এতো শান্ত থাকে না। এযে দেখছি, অঘটন!

অথচ আমার মন চাইছিল যে ঝড় উঠুক, আকাশটা আগাগোড়া কালিমায় ঢেকে যাক, সমুদ্রটা ক্ষেপে গিয়ে হাজার হাজার ঢেউ তুলে জাহাজটাকে ছুঁড়ে মারুক কোনো দ্বীপের খাড়া পাহাড়ের গায়ে! তাতে আমি বাঁচতাম কিনা জানি না, কিন্তু একটা প্রবল উত্তেজনার ঘটনা তো ঘটতো!

কিন্তু না, সে সব কিছুই ঘটলো না, জাহাজটা শান্তভাবে তীরের কাছে এক জায়গায় নোঙর ফেললো, তীর থেকে নৌকোগুলো এগিয়ে

আসতে লাগলো। আমরা যারা নামবো, তাদের নিয়ে যাবার জন্য। দূর থেকে 'আলদাব্রা' 'আলদাব্রা' শুনতাম, কিন্তু কাছে এসে দেখলাম 'আলদাব্রা' একটি দ্বীপ নয়, চারটি দ্বীপের সমষ্টি। তার মধ্যে যেটাকে বলে 'পিকার্ড দ্বীপ', সেটিতেই আমাকে নামতে হলো।

কাপ্তান সাহেব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেন না, আমাকে বা আরও দু-চারজনকে নামিয়ে দিয়ে তাঁর ছোট্ট জাহাজটি নিয়ে চলে গেলেন আড়াইশো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মালগাসী বা মাদাগাস্কারের এক প্রান্ত, কেপ অ্যাম্বারে। সেখান থেকে ফিরে এসে আলদাব্রা ছুঁয়ে আবার যাবেন তিনি উত্তর-পশ্চিমে বেশ খানিকটা এগিয়ে জাঞ্জিবার দ্বীপে লবঙ্গ আনতে। রাণাসাহেব জাহাজে বসে বসেই আমাকে এসব খবরাখবর দিয়ে দিলেন ; কথায় কথায় বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি নিজে ভারতীয়, তাঁর ঐ ছোট্ট জাহাজটাও ভারত-গন্ধী, 'মালাবার'। এই সব কারণেই বোধহয়, জাহাজটা যখন ধোঁযা ছাড়তে ছাড়তে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, আমাব একমাত্র আত্মীয় যেন আমার থেকে নিজেকে জোর করে ছিঁড়ে নিয়ে ক্রমশ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, জীবনে আর বুঝি কোনোদিনই দেখা হবে না!

সাব? আমাব কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে যে মানুষটি আলদাব্রার কাজকর্ম দেখতো, সে পিছন থেকে আস্তে করে ডেকে আমার ধ্যান ভঙ্গ করলো, চলুন একটু বিশ্রাম করবেন না? ম্যানেজার সাহেবের বাংলোয় আপনার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই 'ম্যানেজার সাহেব' কে এই প্রশ্ন করতে ভুলে গেলাম। এই দ্বীপে ম্যানেজার আবার কোন্ কোম্পানীর? আর যদি অন্য কোম্পানী এখানে থেকেই থাকে, তো তাদের ম্যানেজারের বাংলোয় আমি উঠতে যাবো কেন? কিন্তু সে সব কথা আমার মাথায় তখন কাজ করছিল না। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। সে আমার সুট্‌কেসটাকে একটি কুলির মাথায় চাপিয়ে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। মাথায় বেতের ছটা দিয়ে তৈরি হালকা টুপি, খাকি ট্রাউজারের ওপরে দাবা খেলার ছকের মতো হলদে-কালোর চৌকো-চৌকো ঘরের ছাপতোলা বুশ-সার্ট। ঠোঁঠে আর ডান কানের কাছে শ্বেতির দাগ, মাথার শক্ত শক্ত সুপ্রচুর চুলে রীতিমত পাক ধরেছে বলে মনে হয়। গায়ের রঙ মিস কালো নয়, কিন্তু মুখের চামড়া কেমন যেন খসখসে, কোমলতার ছাপ যদি কোথাও থেকে থাকে, তো সে তার চোখের দৃষ্টিতে। নৌকো করে আমাকে জাহাজ থেকে আনতে গিয়েছিল এই বিচিত্র মানুষটিই। এর নামও অদ্ভুত, আহ্‌মেদ বাহেমিয়া।

নামটা যখন প্রথম বলেছিল, তখন আমি শুনতে ভুল করে বলে উঠেছিলাম, বোহেমিয়া ?

তাঁর ঈষৎ-স্থূল ঠোঁঠের প্রান্তে হাসির ঢেউ তুলে সে উত্তর দিয়েছিল, না স্যাব, বাহেমিয়া।

চলুন, সংক্ষেপে এইটুকু বলে আমি তার সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছিলাম ভিতরেব দিকে। একটি পাথুরে পথ কিছুদূর ঢুকে একটু বেঁকে উঁচু হতে চলেছে, দু-ধারে কুলিদেব বস্তি, কাঠের দেওয়াল, মাথায় টালি আছে, কারুর বা খড় জাতীয় কোনো আচ্ছাদন।

দ্বীপে আমার পদার্পণ থেকেই লক্ষ্য করছিলাম, সম্ভ্রান্ত কোনো নবাগতকে দেখলে গ্রামাঞ্চলেব পথচারীরা যেমন একটু দূরত্ব রেখে সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে থাকে, তেমনি করে আশেপাশের লোক আমাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করছিল। তার মধ্যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও আছে, বুড়োবুড়িও আছে, তরুণ-তরুণীও আছে। মেয়েদের পোশাক সিচেলাসের মতোই, তবে কারুর কারুর পরণে কর্মীদের মতো রঙচঙে লুঙ্গিও ছিল। তেমন ভিড় নয়, ছাড়া ছাড়া, এদিকে-ওদিকে ছড়ানো-ছিটানো জনতা। কোনো কোলাহল নেই, কিছু নেই, সব নির্বাক। কেউ পথ চলতে চলতে থেমে গেছে, কেউ-বা হাতের কাজ করতে করতে ; কেউ বা কৌতূহল বশে ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসেছে।

জাহাজ থেকে গাঢ় সবুজের টিপ মনে হয়েছিল দ্বীপটিকে। কাছে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল এক টুকরো বিশাল অরণ্য যেন সমুদ্রের বুক চিরে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপরে চোখে পড়ছিল কিছু কিছু ঘরদুয়ার, পায়ে চলা পথ। তীরে নামবার পর বোঝা গেল, ঠিক পায়ে চলা সরু পথ নয়, একটু চপড়া পথও আছে, যার ওপর দিয়ে জীপ চলে। ঘর-দোর জাহাজ-ঘাটার কাছে কিছু ঘনঘন. কিন্তু তার পরেই সবকিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে।

বাংলোটা অবশ্য বেশি দূরে নয়। সামনে-পিছনে কেয়ারী-করা বাগান, কিন্তু বাংলোর ঘর মাত্র দুটি, একটি বসবার, একটি শোবার। সব সাজানো-গোছানো ছিমছাম। কিন্তু যাঁর বাড়িতে থাকবো বলে এলাম, তিনি কই? ম্যানেজার?

মিঃ বাহেমিয়া?

বলুন স্যর?

কোন কোম্পানীর ম্যানেজার ইনি?

লোকটা অবুঝের মতো ভ্রূ-খুঁচকে বললে, আজ্ঞে?

বললাম. ম্যানেজার-সাহেবের বাংলো বললেন তো? কোন্ কোম্পানীর ম্যানেজার?

বাহেমিয়া এবার আমার কথাটা বোধ হয় ধরতে পারলো, অল্প একটু হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটের কোণে, বললে কোনো কোম্পানীরই ম্যানেজার নয়।

তবে?

সে বললো, কেউ থাকে না এখানে। 'রইস আদমী' যাঁরা আসেন, তাঁরা ওঠেন এখানে। যতদিন থাকেন, ততদিন তাঁরাই ম্যানেজার অর্থাৎ, 'কর্তাব্যক্তি'। সেই জন্যই এই বাড়িটাকে বলা হয় ম্যানেজারের বাংলো।

লোকটি ভাঙা ইংরেজীর সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিয়োল ভাষা মিশিয়ে কথা বলছিল, কিন্তু কথার মধ্যে হঠাৎ 'রইস আদমী' শুনে মনে মনে একটু অবাক না হয়ে পারলাম না।

সত্যি, অবাক হবার মতো কতো জিনিসই না আছে! পোষাক-আশাক বদ্‌লে একটু স্থির হয়ে বসেছি, বাংলোর 'খিদমদ্‌গার' (এ-শব্দটিও বাহেমিয়া উচ্চারণ করেছিলেন) ডিম-টোস্ট্‌ ইত্যাদি দিয়ে জলযোগ করিয়ে গেছে, বাহেমিয়ার কাছ থেকে শুনলাম, দ্বীপে রীতিমত দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে। অথচ এই সব দ্বীপে ঐ ঘটনা ছিল ধারণার অতীত। শ্রমিক যারা, তারা অম্লান বদনে কাজ করতো, মালিকের মর্জিমাফিক মাঝে মাঝে পিঠে যে চাবুক খেতো না এমন নয়। কিন্তু সে-সব দিন চলে গেছে। এমন কি শ্রমিকরা জোট বাঁধতে শিখেছে, জোট বেঁধে কিছু দাবি-দাওয়াও আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তারপরেই দ্বীপে এক নতুন বিভ্রাট আমদানী হলো। কোথা থেকে কিছু বাইরের লোক এসে দ্বীপে নামলো, 'জাতপাত' নিয়ে কথা তুলতে লাগলো, তাতে করে কে আফ্রিকার, কে মালাগাসীর, কে অন্য কোথাকার, এই সব প্রশ্ন উঠলো।

ঠিক এই ব্যাপারটা সিচেলাসে দেখেছিলাম। বেশি দূরে নয়। আমার ঘরের মধ্যেই রয়েছে তার উদাহরণ, স্বয়ং মুবু। ভাবতে গিয়ে মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। সিচেলাসেও না কোন্‌দিন এইসব দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হয় আলদাব্রা দ্বীপের মতো; আলদাব্রায় যেখানে শ্রমিকরা জোট বেঁধেছিল, যেখানে এইরকম উগ্র জাতীয়তা-বাদের বিষ ঢুকিয়ে ওদের এমন করে ধ্বংস করতে চলেছে কারা? কিন্তু সে-সব কথা বাহেমিয়াকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা যায় না, ওর মনোভঙ্গি কী রকম কে জানে?

আমার কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ এ-কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বিপুল শ্রমিকগোষ্ঠী নিয়ে কাজ-কারবার আমাদের কোম্পানীর ছিল না, দ্বীপের কিছু জিনিসপত্র কিনে চালান দেওয়াই আমাদের কাজ। বাহেমিয়া আমাদের হয়ে সে কাজটি করতো, সুতরাং সমস্যা ওদিক দিয়ে নয়। জিনিসপত্র বহন করার জন্য লোকজন দরকার, এই লোকজনের অপ্রতুলতা ঘটলে কিম্বা বহনকারীদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হলে ব্যবসায়ে মন্দা পড়তে

বাধ্য। সে বিষয়ে তদারক করার জন্যই আমার আসা। কিন্তু 'ম্যানেজার-সাহেব'-এর বাংলোয় ওঠার ফলে আমি যে নিজেই ম্যানেজার বা কর্তাব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছি, তা টের পেলাম পরদিন সকাল থেকে। যেন সমস্ত দ্বীপের শ্রমিক-অসন্তোষ মেটানোর দায়-দায়িত্ব আমার।

প্রথমটায় রেগে উঠে বাহেমিয়াকে বলেছিলাম, থাকবার জন্য আর কোনো জায়গা পেলেন না মশাই? আমাকে যে এরা 'রইস আদমী' ধরে নিয়েছে, আমি কী করি?

বাহেমিয়া বললেন, আমাদের কাছে আপনি 'রইস আদমী' বই কী? তাছাড়া, ভিক্টোরিয়া থেকে চিঠিতে সেই রকমই নির্দেশ ছিল। ওঁরা লিখেছিলেন, আপনি রইস আদমী, প্রিন্স—

সর্বনাশ! এ-খ্যাতিটা এখানেও এসে পৌঁছেছে! বললাম, কিন্তু সাহেব তো নই, ব্ল্যাক প্রিন্স।

বাহেমিয়া বললেন, সেই জন্যই তো আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি! যদি সাদা চামড়ার প্রিন্স হতেন, তাহলে, কী যে হতো কে জানে!

কেন!

বাহেমিয়া বললেন, সাদা চামড়া যে-দু-চারজন ছিল, সব পালিয়েছে!

সে কী!

আক্রোশটা তাদের ওপরই বেশি, বাহেমিয়া বললেন, তারাই চাবুক চালাতো, জঘন্য অত্যাচার করতো! ওরা ক্ষেপে গিয়ে ওদের দিকেও রুখে গিয়েছিল। নোঙর ফেলে একটা জাহাজ তখন ছিল বন্দরে, মালবাহী জাহাজ, তাই সেটায় উঠে ওরা তৎক্ষণাৎ মালগাসীর দিকে রওনা হয়ে গেছে! একজন মেমসাহেবও ছিলেন, তাকেও গালিগালাজ করতে ছাড়েনি লোকগুলো!

কিন্তু এ নিয়েও বেশি বাগ্‌বিস্তার করে লাভ নেই। শোনা গেল, সাহেবরা অত্যাচারী বলে শুধু নয়, তারা ওদের সবাইকে ইয়োরোপীয় ধাঁচে গড়ে তুলছে, এর বিরুদ্ধেও হঠাৎ একটা জেহাদ

ঘোষিত হলো। তার উত্তরে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষ যদি এই সাদা চামড়ার মালিকপক্ষ তথাকথিত পুরুষদের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে তো, সেই অস্ত্র ঘুরে শেষ পর্যন্ত ওদেরই ওপরে গিয়ে পড়েছে বুঝতে হবে।

আলদাব্রা ছোটখাটো দ্বীপ, মাদাগাস্কার (মালাগাসী), মরিশাস বা সিচেলাসের মতো তার নামডাক নেই, কিন্তু শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে মালিকদের দ্বীপ ছাড়া করেছে, এ দৃষ্টান্ত স্থাপনায় এ দ্বীপপুঞ্জে আলদাব্রাই বোধ হয় প্রথম।

যাই হোক, সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নানান লোকের নানান সালিসীতে ব্যস্ত রইলাম, সন্ধ্যাবেলাটা কোথায় যাবো, ঐ জাহাজ-ঘাটা যেটাকে বলে, সেখানে গিয়ে একটু ঘুরে বেড়ালাম। অন্তত মাসদুয়েকের আগে যে এখান থেকে নড়তে পারবো না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত, আর তাছাড়া মাসদুয়েকের আগে সিচেলাস-গামী কোনো জাহাজও এসে ভিড়ছে না। এমন কি, জাহাজ না এলে চিঠিপত্র পাবারও জো নেই। এক যদি জরুরী চিঠি আসে মালাগাসী হয়ে। মালাগাসী থেকে সপ্তাহে প্রতিদিন, এমন কী কখনো কখনো দু-দিন পর্যন্ত জাহাজ আসে দরকার পড়লে। মালাগাসীর সঙ্গে মরিশাসের যোগ আছে জাহাজ মারফৎ ; অর্থাৎ ঘনঘন জাহাজ যায়-আসে ঐ দুটি দ্বীপের মধ্যে। তেমনি মরিশাসের সঙ্গে আছে সিচেলাসের জাহাজ সংযোগ। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ওভাবে ঘুরে যাতায়াতও করা যায়, চিঠির আদান-প্রদানও করা যায়। আমি যখনকার কথা লিখছি, তখন এই সব দ্বীরের মধ্যে বিমান চলাচল এতো বিস্তার লাভ করে নি।

কিন্তু যাক সে সব কথা। দিনকয়েক পরেই একদিন মজুররা আসবার আগে বাহেমিয়াকে নিয়ে নিজেই মজুরদের বস্তিতে গিয়ে হাজির হলাম। এই বস্তি সেই বস্তি করে ঘুরলাম অনেক, তাতে খানিকটি যে ফল না হলো এমন নয়, কারণ, এর আগে এ রকম করে কোনো 'কর্তাব্যক্তি' নাকি তাদের খোঁজখবর নেননি।

কিন্তু মজুরদের দেখা পেলেও জাতীয়তার বহ্নি ছড়ানো পুরুতদের দেখা পেলাম না। একজন পুরুত নাকি আমি যে জাহাজ থেকে নেমেছিলাম, সেই জাহাজেই ফিরে চলে গেছে জাঞ্জিবার।

এখানে দেখলাম শান্তিরক্ষার জন্য জনা তিরিশেক বন্দুকধারী পুলিশ রয়েছে, তাদের কর্তাব্যক্তি এদেশী। বলা বাহুল্য পুলিশরাও এদেশী। শোনা গেল দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় এরা জনাকয়েক চাঁইকে গ্রেপ্তার করেছিল, কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছে।

আলদাব্রা সম্পর্কে কর্তা-পুলিশ মহাশয়টি বহু তথ্য জোগাড় করেছেন দেখলাম। তিনি জানালেন, পুরনো ফরাসী পুঁথি পত্তরে এই দ্বীপের উল্লেখ দেখা গেছে। যে সব নাবিক এদিকে এসেছিলেন, তারাই কেউ কেউ উল্লেখ করে গেছেন। এইভাবে এই দ্বীপের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫১১ সালে। তখন এর নাম ছিল 'ইল হাদারা'। তারপর ঐ নাবিকদেরই নক্সাটক্সাতে পাওয়া গেল পরিবর্তিত নাম, 'আলহাদ্রা।' বোধ হয় একটি আরবী শব্দেরই অপভ্রংশ। আরবী শব্দটা হচ্ছে, 'আল আদ্রা, যার মানে 'চিরসবুজ। এই থেকেই ক্রমে ক্রমে হয়েছে 'আল দাব্রা।' কিন্তু অন্য অনেকের মত আবার ভিন্ন। তাঁরা বলেন, বৃষরাশির একটি নক্ষত্রের নাম, 'আলডেবারান।' সেই থেকেই দ্বীপের নাম হয়েছে 'আলদাব্রা।'

কর্তাপুলিশটি খাঁটি নিগ্রো চেহারা, এতদিনে তার নামটা ভুলে গেছি। বেশ গম্ভীর গম্ভীর একটা ভারিক্কী ভাব আছে, কিন্তু আড্ডায় বসলে চেহারা হয় অন্য। তখন তার 'হা-হা-হো-হো'র ঠেলায় অস্থির হয়ে যেতে হবে। একদিন বললে, এই দ্বীপে কোনো মজা নেই, ঘুরে আসুন আসল দ্বীপে। দ্বীপ জোড়া যে 'লেগুন' (উপহ্রদ) টি রয়েছে, সেটি বিরাট, লম্বায় পনেরো মাইল, চওড়ায় কোথাও কোথাও মাইল চারেক হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উক্ত মজা পাবার জন্য একদিনও সেই মূল বা আসল দ্বীপ ঘুরতে যেতে পারলাম না। খাবার জল ঐ দ্বীপেই পাওয়া যায়, পিকার্ড দ্বীপে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়, আর নয়ত

আসল দ্বীপ থেকে আনতে হয়। কুঁয়ো খুড়ে জল বার করে দেখা গেছে সে জল অল্প অল্প লোনা। আলদাব্রার পানীয় জলের সমস্যা আছে।

এখনকার 'সবুজ কাছিম' হচ্ছে ব্যসার অন্যতম পণ্য বিশেষ। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে এক একদিন দেখা যায় রাত্রিবেলা দুশো থেকে তিনশো স্ত্রী কাছিম সাঁতরে তীরে এসে ভিড়ছে ডিম পাড়বার জন্য। এ ছাড়া সুবৃহৎ কূর্মকুল। এদের দেখে অবশ্য আমার মোটেই চমক লাগে নি; বাহেমিয়াকে বললাম, আমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানায় এই কচ্ছপ আমি দেখেছি।

কিন্তু দ্বীপ সম্পর্কে আর বর্ণনা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমাদের কাহিনীতে ফিরে আসি। কর্তাপুলিশের একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানদের যুদ্ধ জাহাজ *'কিওনিসবার্গ'*, যে এদিককার সমুদ্র অঞ্চলে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যাকে ব্রিটিশ ক্রুজারগুলো খুঁজে খুঁজে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল, সে এসে লুকিয়ে থাকতো এই দ্বীপেরই একটি খাঁড়ির মধ্যে, এমনভাবে লুকিয়ে, যে, কেউ তার হদিস পায়নি। সিচেলাস থেকে আসা একটি জেলেদের নৌকো হঠাৎ একে খাঁড়ির মধ্যে দেখতে পায়। দেখতে পেয়ে সিচেলাসে ফিরে গিয়ে খবর দেয়। ব্রিটিশ ক্রুজারগুলোতে সঙ্গে সঙ্গে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। কিন্তু তারা এখানে এসে পৌঁছবার আগেই 'পাখী' হাওয়া হয়ে গেছে।

এইসব নানান কথা শোনা যেতো কর্তামশাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি এই দ্বীপের বিশাল জঙ্গল। কাঠের ব্যবসা এখানে তেমন ফলাও নয়, দেবো নাকি আমাদের কোম্পানীকে এই ব্যবসায়ের প্রস্তাব? দিতে পারি, কিন্তু তার আগে শ্রমিকদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমার চেষ্টা ছিল, কাজ শেষ করে যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে যাবো। ফিরে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে আসি নি, কিন্তু এ দ্বীপে পা দেবার পরই চিন্তার স্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল।

কিন্তু পুরোতরা এদের মধ্যে এমন তীব্র 'জাত-পাত'-এর বিষ ঢুকিয়ে গেছে যে, সহজে তা মেটবার নয়। এক হতে পারে, নতুন কোনো দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন তুলে এদের মধ্যে জোঠ বেঁধে দেওয়া। কিন্তু আমার মতো তথাকথিত 'কর্তাব্যক্তি'র পক্ষে তা সম্ভব হবে কী করে? মালিকপক্ষ কখনোই আমার প্রয়াসকে স্বাগত জানাবেন না। উল্‌টে আমারই চাকরি যাবে। তাহলে? কী করা যায়? মনে হলো, অন্য কারুর মাধ্যমে এ-কাজ করা যায়। আমি থাকবো একেবারে আড়ালে ঐ জার্মান যুদ্ধ জাহাজের মতো, আর সেই মানুষটি আসবে সামনে, নেতা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সামনে আনার মতো লোক হঠাৎ আমি তখন পাচ্ছি কোথায়? বাহেমিয়া হচ্ছেন খাঁটি মধ্যবিত্ত মানসিকতার সন্তান, তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না, তবে, কে আসবে এগিয়ে?

'যার যেমন ভাবনা, তার সিদ্ধিও তেমনি' বলে একটা কথা আছে না? সেই মতো আমিও একটি মানুষকে খুঁজে পেলাম শেষ পর্যন্ত। অবশ্য ততদিনে মাসখানেকেরও ওপর সময় পার হয়ে গেছে।

সাধারণতঃ আমার পক্ষে একা বেরুনো সম্ভব হতো না, বিশেষ করে আমার শুভার্থী বাহেমিয়ার জন্য। যখনই বাইবে বেরুতাম, সে সঙ্গে থাকতো, কখনো বা পুলিশের সেই নিগ্রো কর্তাব্যক্তিটি। বাহেমিয়া বলতো, একা বেরোনো ঠিক না, কার মনে কী আছে কে জানে! এখনো মানুষের মাথা থেকে 'গরমি' যায় নি, ভুল বুঝে একটা কিছু করে বসলেই হলো!

বলা বাহুল্য ওদের পরামর্শ মতো আমি সতর্কতার সঙ্গেই চলা-ফেরা করতাম। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর আর বাংলো ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতাম না। ওরা দুজনেই আসতো, গল্প-সল্প করে চলে যেতো। বইপত্তর সঙ্গে আনিনি, পড়ার কিছু নেই, অতএব মাঝে মাঝে তাস নিয়ে বসতাম। বাহেমিয়ারই তাস, ব্রীজখেলা সে জানতো। পুলিশের কর্তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে একটু কাজ চলা গোছের করে নিয়ে আমরা তিনজনে এক একদিন বসতাম। ওদের

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার অভ্যাস তাই সে খেলার জের প্রায় কখনোই রাত নটার ওপারে যেতো না। কিন্তু তারপরে আমি করি কী? সহজে ঘুম আসতো না, কতগুলি স্মৃতির কাঁটা মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে চাইতো।

এমনি করে আরও বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। একটি নিগূঢ় ব্যথার চিন্তা থেকে মনকে অন্যদিকে সরাবার জন্যই প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরালাম। একদিন রাত্রে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। কলকাতার ছেলে আমি, এ-রকম জ্যোৎস্না কখনো চোখে পড়েনি। 'সিচেলাস'-এ-ও লক্ষ্যে আসেনি ; হয়ত জ্যোৎস্না এমনি করেই সব জায়গায় ফোটে, কিন্তু সে-জিনিস দেখবার অবসর বা মন দুটোই আমার তখন ছিল না। বাংলোয় তখন আমি সম্পূর্ণ একা, দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এলাম। 'ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত'ই পড়ে কিন্তু আমার মনে হলো যেন, ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে চারদিক থেকে!

বারান্দা পেরিয়ে নিচে নামলাম, তারপরে গেট্ খুলে চলে এলাম বাইরে জঙ্গলের ধারে। দিনের বেলার মতো সবই যেন স্পষ্ট, অথচ সবকিছু কোমলতায় ভরা। সূর্যের কিরণ যদি পিতার স্পর্শ হয়, তবে জ্যোৎস্না যেন মায়ের কোমল হাতের পরশ! ধীর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ ভালো লাগার মধ্যে একটা নির্বাক বেদনার ভাষা উদ্বেল হয়ে উঠলো! বহু মূল্যবান কী যেন সম্পদ আমি হারিয়েছি, তা আর কোনদিনই ফিরে পাবো না। বুকের ভেতরটা গুমরে উঠতে লাগলো, চোখ হয়ে উঠলো সজল!

আর ঠিক সেই সময়েই জঙ্গলের ভিতর থেকে কে বা কারা যেন আমার দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ালো। আমি জানতাম, এই দ্বীপে এতো রাত্রে কারও জেগে থাকবার কথা নয়, বিশেষ উৎসবের দিনগুলি ছাড়া। তাহলে, এতো রাত্রে জেগে কাটাচ্ছে, ওরাই বা কারা?

ওরাও বোধহয় আমাকে দেখে অবাক হয়েছিল। ধীরে ধীরে ওরা আমার দিকে এগিয়ে এলো। একটি পুরুষ, অপরটি নারী।

পুরুষটি বোধহয় আমাকে আগে দেখে থাকবে। সবিস্ময়ে বলে উঠলো, ম্যানেজার সাব ?

বললাম, তোমরা কে ?

লোকটি একটু লম্বা, কিন্তু রোগা। একটি লম্বা প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরনে ছিল তার। মেয়েটির পরণে স্কার্ট আর সাদা জামা। ওরা স্থানীয় লোক, নিগ্রোদের মতো হুবহু দেখতে নয়। পুরুষটি বললে, আমার নাম দীনা। এটি আমার স্ত্রী। আমরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

এতো রাত্রে ?

স্ত্রীকে দেখিয়ে বললে দীনা, এই এর জন্যে। বললে, চাঁদের আলোয় বেড়াবে।

স্ত্রীটি ওদের ভাষায় প্রতিবাদ করে উঠলো আমি, ঈশ্‌! তাই বুঝি ? আমি চেয়েছি বুঝি !

দীনা একটু হেসে ওকে যা বললো, তার মানে মনে হলো, এই, ম্যানেজারসাবের কাছে মিথ্যে বলিস না, সাঁই করে চাবুকের বাড়ি লাগাবে !

মেয়েটি উত্তরে বোধহয় বললে, ঈস্। কই, সাহেবের হাতে চাবুক কই ?

দীনা তখনো মিটিমিটি হাসছিল, বললে, 'সাহেব' মানেই চাবুক। যখনই ওরা ইচ্ছে করবে, তখ্‌খুনি হাতে চাবুক এসে যাবে !

ওরে বাবা ! মেয়েটি আঁতকে উঠে আমার দিকে তাকালো।

আমি বলে উঠলাম, তোমাদের ক্রিয়োল ভাষা কিছু কিছু বুঝি। তা ক্ষ্যাপাচ্ছো কেন ওকে ?

দীনা হাসলো, বললে, ক্ষেপীকে ক্ষ্যাপাবো না ? এই নিঝুম রাত, কেউ জেগে নেই সারা দ্বীপে, ও কিন্তু আমার ডাকে দিব্যি চলে এলো, বনে ঢুকে গান গাইলো, নাচলো !

বললাম, তোমার জন্যই মরছে। আর তুমি চাইছিলে, তাই ও এসেছে ! নইলে…

হঠাৎ গলাটা কেমন আট্‌কে গেল, হঠাৎ চোখের কোণে জল এসে গেল কেন?

দীনার পক্ষে আমার এ-ভাবাবেগ বোঝার কথা নয়। সে বললে, সাহেব আপনিও ক্ষ্যাপা কম নন। রাত্রে উঠে বনের দিকে বেড়াচ্ছেন?

বললাম, এ-রকম জ্যোৎস্না যে জীবনে কখনো দেখিনি!

দীনা আমার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে তারপরে বললে, বুঝতে পেরেছি। জ্যোৎস্না উঠলে এ-রকম পাগলামী আমার আসে। কিন্তু সাহেব, এইরকম ক্ষ্যাপামী যার মনের মধ্যে থাকে, সে আর যা-ই করুক, হাতে কখনো চাবুক নিতে পারে না। আর, চাবুক না থাকলে এখানে ম্যানেজারী করবেন কী করে?

উত্তর দিলাম, তুমি যে উল্‌টো কথা বলছো। চাবুক চালাতো বলে সাদা চামড়াদের তোমরা তাড়ালে, এখন আমি চাবুক হাতে নিলে তোমরা কি ছেড়ে কথা কইবে?

দীনার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, সে বললে, কিন্তু সাহেব, চাবুক ছাড়া উপায়ও নেই। আগে সব আমরা মিলেমিশে থাকতাম, এখন বাইরে থেকে লোকজন এসে জাতপাতের ব্যাপার শুরু করে দিয়েছে। এই যে মেয়েটিকে দেখছেন, এ আমাদের ঠিক জাতের নয়। আমি জোর করে একে বিয়ে করেছি বলে কম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়নি। রীতিমতো মারপিট করে আমাকে জিততে হয়েছিল।

বললাম, তাহলে তুমি এইসব জাতপাতের বিরুদ্ধে?

নিশ্চয়ই!

বললাম, তাহলে তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে। দেখা করবে আমার সঙ্গে? কাল?

কখন?

যখন তোমার সুবিধে! ধরো, রাত্রে? যখন আমার বাংলোয় কেউ থাকবে না, তখন?

ঠিক আছে সাহেব। তাই হবে।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। হাত ধরাধরি করে ওরা বাংলো ছাড়িয়ে নিচের দিকে চলে গেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবাব সেই ভাবাবেগ আমাকে আশ্রয় করল। আমার সেই বুকের মধ্যে মোচড়, চোখে জল। কিন্তু না, আমাকে এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই হবে।

পরদিন বাহেমিয়াকে কথায কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'দীনা' বলে কাউকে চেনো? সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো বাহেমিয়ার। সে বললে, লম্বা মতন, রোগা?

হ্যাঁ।

বাহেমিয়ার চোখ প্রায় কপালে উঠলো, ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে নাকি? আস্ত ক্ষ্যাপা লোক।

কীরকম?

বলল, ওর মাথার ঠিক নেই। কখন যে কী করে ফেলবে, ও বোধহয় নিজেই জানে না!

বললাম, কিন্তু ওর উপজীবিকা কী? মানে, কী করে ও?

বাহেমিয়া বললে, মজদুরই বলতে হবে ওকে। তবে, হরেক রকমেব কাজ জানে। কল-কবজার কাজ দিন, সেও করবে, আবার মাল বইবাব সময় মালের হিসাব রাখতে দিন, তাও ঠিক মতো করে দেবে। এছাড়া কচ্ছপ কাটতে ওব জুড়ি নেই!

বললাম, তাহলে, দারুণ কাজের লোক বলুন?

বাহেমিয়ার উত্তর হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। এবং সেজন্য এখানকার শ্রমিকরা ওকে ভালোও বাসে। কিন্তু ভয়ানক খামখেয়ালী। কাজ যখন মন দিয়ে করে, তখন 'জান লড়িয়ে' দেয়, কিন্তু কাজ যদি ছাড়ে, তাহলে আর সে দিকে আর মুখ ফেরাবে না! বসে বসে খাবে 'সেও বি আচ্ছা!'

বললাম, নতুন বিয়ে করেছে বুঝি?

নতুন বিয়ে! বলছেন কী?

বললাম, কাল রাতে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিল বউকে নিয়ে। আমিও একটু বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখা।

বাহেমিয়া অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, বললে, আমাব সব বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে! রাত্রিবেলা বউকে নিয়ে জঙ্গলে বেড়ানো! তাও এখানকার কোনো মজদুর! পাল-পার্বনের কথা ছেড়ে দিন, অন্যসময় ওরা সন্ধ্যা পেরোলেই সব চিৎপাৎ হয়ে ঘুমেব তাল করে! দেখেননি, রাত নটার সঙ্গে সব নিঝুম হয়ে যায়। নাঃ! সত্যি আমাকে অবাক করে দিলেন কথাটা বলে! দাঁড়ান, আমি বাব করছি, রহস্যটা কী! দীনার বউ ছেলেপুলে সামলাবে, না, ওর সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরবে! তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে। বড়োটা মেয়ে, বছর ছ-সাত হবে বয়স! তাহলেই বুঝতে পারছেন? ওটা নিশ্চয়ই অন্য কেউ, ওর বউ নয়।

আমি আর কিছু বলি নি, চুপ করে ছিলাম! রাত্রে যে ওব আসবার কথা আছে, সে-কথা ভাঙলাম না।

সেদিন রাত্রেও ঐরকম ফিন্‌কি দেওয়া জ্যোৎস্না হয়েছিল। বারান্দায় পায়চারী করছিলাম, এমন সময় দীনা এলো। ওকে নিয়ে বাইরে—জঙ্গলের দিকেই চলে গেলাম। বললাম, তোমাকে তো সবাই চেনে, দেখছি।

বলতে ইচ্ছা করছিল, কাল কাকে নিয়ে বেরিয়েছিলে? তোমার বউ?

কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে সরাসরি ওকে জিজ্ঞাসা করতে কিছুতেই পারলাম না। সবে আলাপ হয়েছে, এ অবস্থায় এতো ব্যক্তিগত কথা তুললে ও যদি মনে কিছু করে?

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

উত্তর দিলে, তিনটি।

সবাই ছোট ছোট বুঝি?

ঠিক ধরেছেন। সবাই ছোট ছোট। আর বলেন কেন, ওদের নিয়ে বউটা সবসময় নাজেহাল!

বললাম, তাহলে এইরকম অবস্থায় সময় করে যে বেড়াতে নিয়ে বেরুতে পারো, এতে বাহাদুরী আছে!

বললে, তা একটু বেরুতে হয়! মাঝে মাঝে রবিবার দেখে একটু এদিকে-ওদিকে যাই বাচ্চাদেরও সঙ্গে নিয়ে, পিকনিক করতে!

খুব ভালো! বলে তারপরেই নিজের কথাটি বললাম, এখানকার মজদূরদের যে-অবস্থা দেখছি, তা সুবিধের নয়। এতো কম পয়সায় এইরকম খাটুনি!

দীনা চোখ বড়ো-বড়ো করে আমার দিকে তাকালো, তারপর বললো, এই প্রথম একজন ম্যানেজার সাহেবের মুখে এইরকম কথা শুনছি! কিন্তু সাহেব, সবই তো আপনার হাতে! দিন না আমাদের তলব বাড়িয়ে?

হেসে বললাম, তুমিও এই ভুল করলে? আমি কি তলব বাড়াবার মালিক?

সে কী! সবাই যে বলে—

বাধা দিয়ে বললাম, সবাই বলুক। তুমি বলবে কেন? তোমাকে আমি একটু অন্যরকম লোক ভেবেছি। তা নইলে এতো লোক থাকতে তোমাকে ডাক দেবো কেন?

বোধহয় খুশি হলো কথাটা শুনে। বললে, আমাকে কী করতে বলেন সাহেব?

সবাইকে জাতপাত ভুলে এককাট্টা হতে হবে। তা না হলে আদায় হবে কী করে?

তা ঠিক।

বললাম, কিন্তু একটা কথা। কাউকে ঘুণাক্ষরে আমার কথা বললে চলবে না। সব তোমাকে একা হাতে করতে হবে। আমার কাছে তুমি আসবে এইরকম রাত্রিবেলায়, সব-কিছু নিঝুম হয়ে যাবার পর। আমরা বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলে চলে যাবো। কোথাও বসে শলা পরামর্শ করবো। রাজী?

দীনা গম্ভীর হয়ে বললে, আপনি বলছেন দাবি দাওয়ার আওয়াজ

তুললে জাতপাতের ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে।

নিশ্চয়ই যাবে।

আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, বললে, তাহলে ঠিক আছে। আমি আপনার কাজ করবো।

পরদিন থেকে দীনার কাজ শুরু হয়ে গেল। আমি টের পেলাম, রাত্রে, যখন ও আমার কাছে এলো। বললে, কাজ শুরু করেছি সাহেব। এমনভাবে কথা বলছি, যেন জেহাদটা আপনার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ দাবি-দাওয়া নিয়ে আপনার কাছেই আমরা মিছিল করে আসবো।

বললাম, বলো কী! একদিনেই এতদূর!

দীনার উত্তর: মাতব্বরদের সঙ্গে কথা বলেছি। বলেছি, জোট বাঁধো হে, জোট বাঁধো, নইলে কিছু হবে না।

ঠিক আছে। এগিয়ে যাও।

পরদিন বাহেমিয়া বোধহয় একটু আঁচ পেয়েই আমার কাছে কথাটা পাড়লো। বললে, আপনার দীনা তলে তলে কুলি খ্যাপাচ্ছে।

তা খ্যাপাক না? আমাদের কী?

বাহেমিয়া বললে, আপনি ম্যানেজার-সাহিব, সব ঝড় যে আপনার ওপরই এসে পড়বে।

সে তখন দেখা যাবে।

বাহেমিয়া একটুক্ষণ থেমে তারপরে বললে, আর একটা কথা জানেন? যাকে নিয়ে সেদিন রাত্রে ও জঙ্গলে বেড়াতে বেরিয়েছিল, সে ওর বউ নয়, অন্য জাতের একটি মেয়ে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

ঠিক জানো?

জেনেছি বলেই আপনাকে বলছি।

পরদিন রাত্রে দীনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে কথাটা

তুললাম। বললাম, দীনা তোমার নামে কিন্তু একটা কথা রটছে। কথাটা সত্যি না হলেই খুশি হবো। কারণ, তুমি নেতা হতে চলেছো, তোমার নামে নিন্দা রটলে তোমার কাজের ক্ষতি হতে পারে!

কী নিন্দা সাহেব? দীনা বললে, আমি আর একটা বিয়ে করেছি, এইতো? দেখুন, তাতে যদি আমার স্ত্রীর আপত্তি না থাকে, তাহলে অন্য লোকের বলার কী থাকতে পারে?

কিন্তু মেয়েটি নাকি ভিন্ন জাতের?

দীনা বললে, হ্যাঁ, তা ভিন্ন জাতের। সেই জন্যই তো আমি আপনার কাজটি হতে তুলে নিলাম। দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সবাই এককাট্টা হয়ে কাজে নামলে, তখন জাতপাতের ব্যাপারটা আপনিই দূর হয়ে যাবে আপনি বলেছেন। আমাদের ছোট দ্বীপের মজদূরদের সমাজটা আবার আগের মতো হয়ে উঠুক, এইটাই আমি চাই।

খুব ভালো, বললাম, দ্যাখো দীনা, মেয়েটাকে কি তুমি বিয়ে করে ফেলেছো?

ও বললে, করিনি, তবে করবো। জাতপাতের ব্যাপার না মিটলে করবোই বা কী করে? পুরুত কি আসবে?

বুঝলাম।

ও বললে, ভাববেন না, কাজ ঠিক চালিয়ে যাবো। এতে আমার দু-গুণ লাভ, বউও পাবো, মজুরিও বাড়বে।

বলে একটু দম নিয়ে তারপরে বললে, এখানে একদল ডুবুরি আছে, যারা মুক্তো খুঁজে বেড়ায়। কাল তাদের সঙ্গেও কথা বললাম। তারাও আমাদের সঙ্গে সামিল হবে বলেছে।

ভালো কথা।

পরদিন যথারীতি কাজকর্ম চললো। নিগ্রো পুলিশ অফিসারটি বললে, দীনা বলে একটা লোক আপনার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে, বুঝলেন? সাবধানে থাকবেন?

বললাম, কী বলছেন? আমার বিরুদ্ধে কিসের জন্য ঘোঁট পাকাবে?

আপনি ওদের তলব বাড়িয়ে দেবেন।

তলব বাড়াবার মালিক কি আমি?

ওরা অতো সব বোঝেনা। কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে ক্ষেপলেই হলো!

একটু হেসে বললাম, আপনি তো আছেন।

এইভাবে দুই নৌকোয় পা দিয়ে আমার চলছে। আমার এ দ্বীপে থাকবার বয়স হয়ে গেল দুমাস। এমন সময় একদিন বাহেমিয়া আমার হাতে একটা চিঠি দিলো। হেড-অফিসের চিঠি নয়। জাহাজ এসেছে মালাগাসী থেকে। সেই জাহাজ থেকে এসেছে চিঠি। খুলে দেখলাম, চিঠি দিয়েছে ডঃ টমাস। লিখেছে:

'আমি মালাগাসী হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি, যাবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা হলো না বলে দুঃখিত। আপনার সহৃদয় আতিথ্যের কথা, আপনার অকপট বন্ধুত্বের কথা কখনো ভুলবো না। যার জন্য চিঠি লিখছি সে-বিষয়টা হচ্ছে, সিচেলাসে রাজা প্রেম-পে-র সন্তান-সন্ততিদের খোঁজখবর আমি পেয়েছি। পেয়েছি তাদের পরিচয়। আমি দেশে যাচ্ছি সেই খবরগুলো নিয়ে যদি তাদের আবার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। আপনার মুবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে আপনাকে খুবই ভালবাসে। আপনি না থাকায় সে মুষড়ে পড়েছে। তাকে আমি সবকথা বলে এসেছি। আপনি কবে ফিরছেন? ফিরলে দেখবেন আপনার জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। হয়ত আবার একদিন দেখা হবে। শীগ্‌গির শীগ্‌গির সিচেলাসে ফিরবেন আশা করছি। প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানবেন।'

ওর চিঠির সুর আর মুবুর কথা যেন আমাকে চুম্বকের মতো সিচেলাসের দিকে টানতে লাগলো। আমি সেদিন দীনাকে বললাম, আর কতো দেরি? আর সাতদিন পর মরিসাসের জাহাজ আসছে শুনলাম। সেই জাহাজে করে আমি সিচেলাসে ফিরে যাবো। আর দেরি সইবে না!

বলা বাহুল্য, দীনার চেষ্টায় মোটামুটি একটা শ্রমিক-অসন্তোষ দানা বাঁধলো, এবং সেই সূত্র ধরে জাতপাত ভুলে সব এক হলো। এমন কি নির্বিঘ্নে দীনার দ্বিতীয় বিবাহও অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ওদের জমায়েতে যখন আমার ডাক পড়লো, তখন ওদের সামনে গিয়ে 'মালিকদের সব জানাবো, তোমাদের দাবি যাতে মানা হয় সে চেষ্টা করবো' বলা সত্ত্বেও কিছু লোক শান্ত হলো না। সংক্ষেপে বলি, আমার তৈরি ফ্র্যাঙ্কেষ্টাইন আমাকেই আঘাত করে বসলো। আমার রক্তাক্ত অচেতন দেহটা দু-হাতে জাপটে ধরেছিল ঐ দীনা। সে-সময় বাহেমিয়া বা সেই পুলিশ অফিসার কারুরই টিকি দেখতে পাইনি।

জমাট অন্ধকার। আমাদের কলকাতায় যে রকম মা-কালীর ঘোর কালো মূর্তির পূজা করে অনেকে, সেই রকম প্রগাঢ়, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমার চেতনার সামনে। যেন ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ, তার মধ্য দিয়ে কোথায় কত দূরে চলেছি—ক্রমাগত চলেছি কে জানে, হঠাৎ একসময় মনে হলো, কোথাও থেকে আসছে খুব অস্পষ্ট, আবছা একটু আলো। তারপরে মনে হলো, সেই আলোটা চক্রাকারে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, প্রথমে ধীরে ধীরে, তার-পরে খুব জোরে, প্রবলভাবে। কেমন একটা অব্যক্ত অস্থিরতা, অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন অনুভব করতে লাগলাম।

এই মানসিক ভাবাবেগ বাইরে কতটা ফুটে উঠেছিল জানিনা, মনে হলো কেউ একজন যেন আমাকে ডাকলো, খুব মৃদু গলায়, এতো মৃদু যে শোনা যায় কি না যায়। আস্তে আস্তে সম্বিত ফিরে আসতে দেখলাম, এ কণ্ঠস্বরের অধিকারী আর কেউ নয়, দীনা।

সাহেব?

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম, এ আমি কোথায়?

জাহাজে।

ওর চোখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম। ও বললে, সিচেলাসেরই জাহাজে। আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে-

ছিলাম। সেখানে একটু জ্ঞান ফিরলেও অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বললে, সিচেলাসের জাহাজ ছাড়ছে, ওকে এখুনি নিয়ে যাও। ভালো চিকিৎসা হওয়া দরকার। তাই আপনাকে নিয়ে এলাম।

ওরা?

দীনা বললে, ওরা কে? বাহেমিয়া সাহেব? তিনি জাহাজে বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন একথা ঠিক। কিন্তু অনেক কাজ তাঁর, তিনি আসতে পারবেন না। তাই তাঁকেই বলেছিলাম, আমার ঘরে একটা খবর দেবেন, নইলে ভীষণ ভাববে আমার স্ত্রী। আমি নিজেই যাচ্ছি সাহেবকে নিয়ে সিচেলাসে।

জাহাজে ডাক্তারও অবশ্য আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সিচেলাসের ভিক্টোরিয়ায় নামবার পর প্রথমেই যেতে পারলাম না আমার বাড়িতে, যেতে হলো হাসপাতালে। খবর পেয়ে মুবু এলো। কিন্তু আমার মন চঞ্চল ছিল অন্য কাউকে দেখার জন্য। মুবু এটা বুঝল দিন কয়েক কেটে যাবার পর। বললে, প্রিন্স, একটা খবর জানেন না বোধ হয়? সেই পাগলা ফ্রীম্যান সাহেব আবার ফিরে এসেছে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে। হৈ-হৈ করে পাথর ফাটাচ্ছে আবার। আমিও সেই কাজে লেগে গিয়েছিলাম। কী করবো? চুপচাপ তো বসে থাকতে পারি না।

বললাম, তাহলে রোজ-রোজ আমাকে এসময় দেখতে আসিস কী করে?

এখন কামাই করছি, বলতে বলতে মুবুর মুখখানা কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে, যে জন্য গিয়েছিলাম, তা আর হলো না, তাই আর মিছি মিছি খেটে কী করবো? তাছাড়া, আপনি এসে গেছেন, তখন আর অন্য জায়গায় ঘুর ঘুর করবো কেন?

বললাম, কিন্তু কী জন্য গিয়েছিলি, তা তো বললি না?

ওর মুখখানা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললে, শুনেছিলাম সাহেবের পাহাড়ের গর্তে নাকি অনেক মণিমুক্তো আছে। কিন্তু এখন দেখছি,

সব ঝুট, একটাও মণিমুক্তো নেই। ওটা ওর পাগলামী! বউকে হারিয়ে যেন আরও পাগল হয়ে গেছে!

'বউকে হারিয়ে' মানে?

মুবু বললে, বউ পালিয়ে গেছে। জাহাজ ধরে মালাগাসি, সেখান থেকে প্লেনে করে একেবারে নিজের বাড়ি-ইংল্যাণ্ডে।

একা?

হ্যাঁ, একাই তো শুনেছি।

আমার সব ঔৎসুক্যের অবসান হয়ে গেল। মেরী আর ফিরবে না। জানিনা 'হাউফম্যান'-এর অবস্থা এখন কীরকম, কিন্তু আমার কথা বলতে পারি, আমার মনের ভিতরে যে ক্ষীণ আকারে প্রদীপ শিখাটি জ্বলছিল, তা যেন দপ করে নিভে গেল। অসীম শূন্যতা আমার মনের আকাশে। অত কাণ্ডের পরও আশা ছিল হয়ত সিচেলাসে ফিরে এলে দেখা হবে, কিন্তু তা হলো না। প্রচণ্ড অবসাদ আমার শরীর মনকে অধিকার করলো, আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম।

মুবু প্রশ্ন করলো, শরীর খারাপ লাগছে প্রিন্স?

হাত নেড়ে নীরবে জানালাম, না।

মুবু একটুক্ষণ চুপ কবে থাকবার পর বললে, এই দীনা লোকটি কে, প্রিন্স?

ওর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, বললাম, আমার জীবনদাতা।

মুবু অবাক অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো, তারপরে অদূরের বারান্দায় যেখানে দীনা দাঁড়িয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছিল, সেই দিকে চোখ ফেরালো।

বললাম, কত লোক ক্ষেপে গিয়েছিল। মরেই যেতাম, যদি দীনা না হুমড়ি খেয়ে পড়তো।

মুবু বললো, লোক ক্ষেপলো কেন? আর ক্ষেপবার সম্ভাবনা যেখানে রয়েছে, সেখানে আপনি ছুট্ করে গেলেনই বা কেন? আপনার অফিসের লোকেরা বললে, আপনি নিজে ইচ্ছে করেই গেছেন, ঠিক এই সময় আপনার পক্ষে নিজে না গেলেও হয়ত

চলতো।

ওসব কথা থাক।

মুবু বললে, না না, প্রিন্স, আলদাব্রায় যাওয়া আপনার উচিত হয়নি।

তারপরে একটু থেমে আবার বললো, এখন কতদিন আপনাকে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয় কে জানে। আমি কোথায় ভাবছিলাম, আমি আপনাকে ঘরে নিয়ে যাবো আজই, কিন্তু ডাক্তার সাহেবরা--

বাধা দিয়ে বললাম, না, ঘর নয়, হাসপাতালই ভালো। লয়ার খবর কী? সে এখন কোথায়?

মুবু আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, তারপরে চোখ নামিয়ে প্রায় ফিসফস করেই বললে, তার ডেরাতেই সে আছে। আপনি বাড়ি ফিরলে তাকে আনবো।

আমি এখন বাড়ি ফিরবো না—হাসপাতালে যতদিন পারা যায় থাকবো। এখানকার কেবিনগুলো ভালো, নার্সরাও যত্নআত্তি করে।

সে আপনি প্রিন্স বলে তাই। আমরা হলে—

বলেই, সে কাঁধটা সরিয়ে একটু তাকালো, কথা শেষ করলো না।

একটু একটু করে ভালো হয়ে উঠছি, এমন সময় দীনা বিদায় নিয়ে চলে গেল, বললে, মরিশাসের একটা জাহাজ এসেছে, আলদাব্রা যাচ্ছে, আমি অনেক কাণ্ড করে একটা টিকিট জোগাড় করেছি, চলে যাই, কেমন?

আমি অফিসের 'বড়বাবু'কে ডেকে ওর খরচ-খরচাসহ কিছু বাড়তি টাকা দিয়ে দিতে বললাম। ওকে বললাম, দীনা তোমার ঋণ শোধ হবার নয়। চিঠি লিখো। আমিও লিখবো।

আচ্ছা সাহেব!

যাবার সময় ছলছল করে এলো তার চোখ, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অধ্যায়ও যেন শেষ হয়ে গেল। মুবু এলে বললাম, দীনা চলে গেছে। এখন তুই-ই

ভরসা।

ও উৎসাহিত হয়ে বললে, ডাক্তার সাহেবকে বলুন, আমি সব-সময় আপনার কাছে, ঐ দীনার মতো··· ।

ওর হাতখানা হাত বাড়িয়ে ধরলাম, বললাম, দরকার নেই মুবু, নার্সরা আছে না? তুই বরং একদিন একটা খুদে মাটোর বোট্ জোগাড় কর—একটু সমুদ্র ঘুরে আসি। জানালা দিয়ে উধাও সমুদ্র দেখি, আর মনটা আনচান করে ওঠে।

ওর চোখ দুটো উৎসাহের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো, যাবেন?

নিশ্চয়ই।

ঠিক আছে, সেরে উঠুন, বাড়ি চলুন, তারপরে যাওয়া যাবে।

বললাম, নারে মুবু না। আমি সেরে উঠে আগে সমুদ্রে ঘুরবো, তারপরে বাড়ি যাবো।

কেন বলুন তো?

তুই আমাকে জানিস। যেদিকে আমার ঝোঁক হবে, সেটা তখখুনি করা চাই, না হলে আমার ভীষণ অশান্তি হয় ভিতরে ভিতরে।

হ্যাঁ, তা বটে, আমিই ভুলে গিয়েছিলাম।

বললাম, আমার কথা থাক। তোর কথা বল?

আমার কী কথা, প্রিন্স?

বললাম, ঐ যে মণিমুক্তোর লোভে পাথর ফাটাতে গেছলি, কিন্তু যেজন্য গিয়েছিলি, তা আর হলো না বলে ফিরে এলি। কী কাজ তোর হলো না রে?

মুবুর মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল, বললে 'কাজ' নয় প্রিন্স, আমি চেয়েছিলাম একটা জিনিস, মুক্তো। তা যখন পেলাম না, তখন দেখছি সমুদ্রে গিয়েই খোঁজা ভালো, যাবেন আপনি সত্যি সত্যি? তাহলে আমার কাজটাও হয়।

খুব ভালো। আমি যাবোই। ডাক্তার যেদিন ছুটি দেবে

সেদিনই যাবো।

তা ছুটি পেতে পেতে আরও তিন সপ্তাহ কেটে গেল। সম্পূর্ণ সুস্থ আমি, হাঁটতে পারি, ঘুরতে পারি, ক্লান্তি বোধও করি না, অনায়াসে বাড়ি ফিরে গিয়ে তারপরে সমুদ্রে বেরিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আমার আর তর সইছিল না, তার ওপরে মুবু যখন আমার আদেশে 'বোট' ঠিক করে ফিরে এলো তখন আর নিজেকে বেঁধে রাখি কী করে? বেরিয়ে পড়লাম। ঝলমল রোদ্দুর, আকাশে হালকা সাদা মেঘ, সমুদ্রের জল নীলিমায় নীল এবং ধীর-স্থির, কোথাও বিক্ষোভ নেই, জানালা দিয়ে এ দৃশ্য দেখে আর কি ঘরে বসে থাকা যায়?

আমাদের লক্ষ্য ছিল শান্ত বারিপ্রবাহ পেরিয়ে 'প্রবাল-প্রাচীর'-এর কাছ পর্যন্ত যাওয়া, যার পরপারে সমুদ্রে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে কল্লোল। সারা দুপুরটা আমরা শান্ত সরোবর-প্রতিম জলরাশিতে এদিক-ওদিক ঘুরে বিকেলের দিকে রওনা দিলাম প্রবাল-প্রাচীরের দিকে। তখন ভাঁটার টান আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রবাল-প্রাচীরের কোনো কোনো অংশ মাথা তুলছে। ছোট্ট বোট, ছোট্ট একটা মটোর ফিট করা তাতে। দু-রকম বন্দোবস্তই আছে, মটোর বন্ধ করে দু-হাতে দাঁড়ও চালনা করা যায়।

সত্যি কথা বলতে কী, অদ্ভুত একটা শান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা জলরাশি পার হয়ে যাচ্ছিলাম। বিকেলের স্তিমিত আলোয় সমুদ্র উদ্ভাসিত। যতই সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিমে, ততই রং পরিবর্তন হচ্ছে জলধির। হালকা নীল থেকে ক্রমশ গাঢ় নীল। প্রবাল-প্রাচীরের কাছাকাছি হবার আগেই হয়ে গেল ঘোর বেগুনী রঙ; মুবু করলো কী, এক জায়গায় এসে বোটের মুখটা ঘুরিয়ে দিলো, মটোর বন্ধ করলো, হাতে তার বদলে দাঁড়ও তুলে নিলোনা, বোট্‌টা তার সমস্ত গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, জলরাশি ওখানে একেবারে ধীর-স্থির। মুবু নিশ্চুপে আমার কাছে এসে ইঙ্গিতে আমাকে তাকাতে বললো নিচের দিকে। তাকালাম। কিন্তু

এ কী দেখছি !

যেন স্বপ্নরাজ্য ; গভীরতায় বড়ো জোর তিন-চার ফিট মাত্র। স্বচ্ছ কাঁচের মতো টলটলে জল। এতো স্বচ্ছ এতো নিস্তরঙ্গ যে, তলাকার পরিচ্ছন্ন বালির কণাগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফোটা ফুলের মতো অসংখ্য প্রবাল-পুষ্প। বেশির ভাগই লাল রঙের, কোনোটা গাঢ়, আবার কোনোটা ফিকে। এক পুষ্প থেকে আর এক পুষ্পে রেশমী সূতোর মতো সূক্ষ্ম সবুজ শ্যাওলা মালার মতো জড়িয়ে আছে। হলদে বালিব রঙে, প্রবাল ফুলের গাঢ় লাল আর গোলাপী রঙে, বেশমী সূতোব মতো শ্যাওলার সবুজ রঙে, সে যে কী অপূর্ব শোভার সৃষ্টি কবে রেখেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তার মাঝে মাঝে দেখলাম— ঝিনুক, কোনোটা ডানা বোজা, কালো-কালো, আর কোনোটা ডানা-খোলা, একেবারে রজত-শুভ্র। এর মধ্যে তো লুকিয়ে থাকে আলোকবিন্দুর মতো উজ্জ্বল মুক্তা। দুই পিপাসার্ত চোখ মেলে আমি প্রাণভরে দেখে নিচ্ছিলাম সেই স্বপ্নরাজ্যের অপরূপ বর্ণ-সমাবেশ, হঠাৎ মুবু করলো কী, উবু হয়ে বসে চট্ করে হাত বাড়িয়ে দিলো একটা ঝিনুকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর হাতটা ধরে ফেলে-ছিলাম তাই রক্ষে, নইলে যে কী বিপদের মুখে সে ঝাঁপ দিয়েছিল, তা ভুক্তভোগী অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝবেন। জলে হাত পড়ার যে সামান্য চাঞ্চল্যটুকুর সৃষ্টি হবে, তাতেই মুহূর্তের মধ্যে যে কোনোদিক থেকে তীরবেগে ছুটে আসতে পারে রাক্ষুসে হাঙরের দল! বড়ো হাঙরের কথা বলছিনা, কিন্তু ছোট হাঙরও তো আছে, তাদের দাঁতের তীক্ষ্ণতাও কম নয়। প্রবাল-প্রাচীরের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে যে ছোট-বড়ো নানা ধরণের হাঙর ঘুরে বেড়ায় একথা আমারও জানা মুবুরও জানা। শিকারীরা যখন আসে, তখন দল বেঁধেই আসে, ভুলেও একা আসে না। আমাদের ভারতবর্ষের জঙ্গলে বাঘ তাড়ানোর জন্য কাড়া-নাকাড়া আর শিঙা বাজাবার মতোই রীতিমত সোরগোল তুলে জলজ প্রাণীজগতে প্রথমেই একটি ত্রাসের সঞ্চার করে নেয় তারা,

তারপরে নেমে পড়ে কাজে। শুধুই কি হাঙর? যে দ্বি-পক্ষ জীবন্ত ঝিনুক মুক্তো দিলেও দিতে পারে, সেই ঝিনুকও কি কম বিপজ্জনক নাকি? যে ঝিনুক তুই শুভ্র ডানা খুলে রাখে, সেই ঝিনুকে সহজে হাত দিতে নেই। অদ্ভূত স্পর্শকাতর ওরা। হাত পড়তে না পড়তেই সজোরে বন্ধ হয়ে যাবে ডানা তুটি, আঙুল আর ছাড়ানো যাবে না, তুটি শক্ত ডানার তুই কিনারাতে ধারালো চাপ পড়ে হয়ত আঙুলটি কেটে রযেই গেল ঝিনুকের মধ্যে। এ-রকম তুর্ঘটনার কথা এ-সব অঞ্চলে বহু শোনা গেছে। এই মুবুই আগে এ-ধরণের গল্প কবেছে কতো! শুধু আঙুল-কাটার ঘটনাই নয় প্রাণ পর্যন্ত চলে যেতে পারে। এভাবে ঝিনুকে আঙুল কেটে গেলে অনেক সময় বিষাক্ত হয়ে ওঠে শরীর, বোটে কবে হ্রদ পেরিয়ে হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ত বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, তখন শত চিকিৎসাতেও রোগীকে বাঁচানো তুষ্কর।

সেদিন সেই দিনের-আলো-মিলিয়ে যাওয়া আসন্ন সন্ধ্যার মুহূর্তে প্রবাল-প্রাচীর সংলগ্ন শান্ত জলধাবা পেরোতে পেরোতে আমি মুবুকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, সবকিছু জেনে শুনেও সে অমন কবে ঝিনুকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কেন?

প্রথমে উত্তর দিতে চায নি, আমি পড়াপীড়ি করতে অগত্যা বলে ফেললো, একটা মুক্তো পাওয়া গেলে বেশ হতো! পাগলা সাহেবের পাথরের গর্তে যখন মুক্তো পাওয়া গেলনা, তখন সমুদ্রের কাছে ছাড়া মুক্তো চাইবো কার কাছে?

বললাম, তা বলে ও-ভাবে বেঘোবে প্রাণটা দিতে? কারুর কাছ'থেকে একটা মুক্তো কিনে নে না?

মুবু উত্তর দিলো, কী যে বলেন প্রিন্স, টাকা পাবো কোথায়, সামান্য মজুর আমি? আর তাছাড়া এসব দ্বীপে পাপ ঢুকেছে, সবাই ঝুটা জিনিসের ব্যবসা করতে শুরু করেছে আজকাল, কার কাছে খাঁটি জিনিসটি পাবো বলুন?

খাঁটি আর অ-খাঁটি চিনতে শিখেছিস তো?

চুপ করে রইলো, মাথাটা নিচু। কোনো দিকে কোনো আওয়াজ নেই, বোটের খুদে মটোরটা একঘেয়ে ভট্‌ভট্‌ শব্দ করে চলেছে শুধু। বললাম, তা, খাঁটি জিনিস যদি পাস তো, কাকে দিবি? নিশ্চয় কাউকে দেবার মন করেছিস?

মুবু উত্তর দিলো, হ্যাঁ।

কাকে দিবি!

মুখ না তুলেই সে বললে মৃদু গলায় লয়াকে।

লয়া?

হ্যাঁ।

উৎসাহিত হলাম, বললাম, ঠিক করে বলতো ঘটনাটা কী? লয়াকে কখনো কিছু দিয়েছিস, এর আগে? কিল-চড়-ঘুঁসি-লাথি ছাড়া?

যেন চাবুক খেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো মুবু, আর লজ্জা দেবেন না প্রিন্স, আর লজ্জা দেবেন না!

কিছুই যখন ওকে দিসনি এ-যাবৎ, তখন হঠাৎ মুক্তোর মতো দামী জিনিস দেবার তোর সখ হলো কেন?

ও চোখ তুলেও আবার নামালো, বললে, তাহলে আপনাকে গোড়া থেকে কথাটা শুনতে হবে।

বেশ। শুনবো।

শুনুন তাহলে, মুবু বললে, আপনি তো আলদাব্রা চলে গেলেন, দিন যায়, হঠাৎ সবাই বলতে আরম্ভ করলো, মুবু মেয়েটাকে তুই বিয়ে করে ফেল!

অ্যাঁ! লয়াকে বিয়ে করেছিস তুই!

মুবুর মুখে একটি ব্যথার ছাপ পড়লো, হতাশার ভঙ্গি করে বললে, কই আর করলাম!

তবে?

মুবু বললো, ওদের কথার চাপে পড়ে লয়াকে বিয়ের কথা। তারপর—

তারপর ?

মুখ তুলে মুবু এবার বললো, কী হলো জানেন প্রিন্স, রাজী হয়ে গেল !

তাহলে বিয়েটা হলো না কেন ?

মুবু বললে, বিয়ের সব ঠিকঠাক। যেদিন বিয়ে হবে সেদিনই পেলাম খবরটা।

কী খবর ?

মুবু সোজা হয়ে বসলো। বললে, আপনার সেই গ্যাব্রিয়েল সাহেবকে মনে আছে না ?

হ্যাঁ, ডক্টর টমাস গ্যাব্রিয়েল।

হ্যাঁ প্রিন্স, তিনিই। তিনি আপনাকে আলদাব্রায় একটা চিঠি লিখেছিলেন না ?

এবার সোজা হয়ে বসলাম আমি। বললাম, ঠিক কথা। চিঠিতে তোর কথা লিখেছিলেন, তাতে ছিল, তোর কাছে জিজ্ঞাসা করলেই আমি সব জানতে পারবো। আমার জন্য নাকি এক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে! ঈস্! আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সিচেলাসে এসেই তোকে আমার সে-কথা বলা উচিত ছিল। কী ব্যাপারটা বলতো ?

মুবু আরও গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তিনি আপনাকে চিঠি লেখার পরই চলে গেলেন। তিনি সব খোঁজখবর করেছিলেন কিনা ? দারুণ পণ্ডিত মানুষ। আমি আসল কথাটা তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম।

কিন্তু কথাটা কী ?

মুবু বললে, আপনি বিয়ের কথা বলেছিলেন না ? ঐ কথাটা শোনবার পর আর কি আমি ওকে বিয়ে করতে পারি ? বিয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিতে হলো। কেন জানেন ? ও যে আমাদের আশান্তি সর্দারের মেয়ে !

আপান্তি সরদার !

হ্যাঁ. প্রিন্স, মুবু বলতে লাগলো, আপনি ফিরে গিয়ে কাওয়াসজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি বুড়ো কাওয়াসজী সাহেবের কথা বলছি. তিনি সব জানেন। আমার আবার কিছু মনে থাকে না ছাই! আসল কথা যখন জানতে পারলাম, ও রাজার মেয়ে, আর আমি ওরই বাপের ক্রীতদাসের ছেলে, তখন কি বিয়ের কথা ভাবা যায়?

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর কথার মানে আমি তখনো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না! রাজার মেয়েই বা কে, আর ক্রীতদাসই বা কে? একজন ঝি, অন্যজন 'রান্না করার লোক'। তবে হাঁ, আশান্তি সর্দার বলে একজনের কথা টমাসের কাছ থেকে শুনেছিলাম বটে! রাজা প্রেমপে। এই রাজার কথাই কি বলছে মুবু?

মুবু বললে, আমাদের সেই পুরুতের কাছে গিয়ে 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন' করেছিলাম, জানেন প্রিন্স? কিন্তু মুশকিল হয়েছে। মুশকিল কী জানেন? পুরুতকে স্বপ্নে জানিয়েছেন, দেবতা ওতে শান্ত হন নি, হবেনও না।

আবার সেই কুসংস্কার! দ্বীপের লোক, সবাই ছিল দিব্যি মিলেমিশে, কিন্তু কোথা থেকে এলো হঠাৎ এই উগ্র জাতীয়তার উৎপাত! পুরুত, 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন' সবই আরম্ভ হয়ে গেল! এযে কতদূর পর্যন্ত শিকড় নামবে, তা বলা কঠিন। কিন্তু মুবুর মুখের দিকে তাকিয়ে এ-সব আর বলা গেলনা, বললে তার কানে ঢুকবেও না। তাই ওর কথার জের টেনে একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলে উঠলাম, বটে! কিসে শান্ত হবেন?

মুবু বললে, শুনবেন কিসে শান্ত হবে? তবে শুনুন, পুরুত মশাই আমাকে সব বলেছে। লয়া অর্থাৎ রাজকন্যা একটা জিনিস চাইবে আমার কাছে। আমি যদি সেটা দিতে পারি। তাহলেই দেবতা শান্ত হবেন॥ যতদিন না তা দিতে পারি, ততদিন পাপ চলতেই থাকবে।

ব্যঙ্গের স্বর আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠলো আমার, বললাম, চলতেই থাকবে ?

মুবু হঠাৎ এই সময় গলার স্বরটা নামিয়ে যেন গোপন কথা বলছে, এমনি ফিসফিসানি সুরে বললে, সেদিন পুরুতের মন্ত্রপড়া হাড়টা মাথায় ঠেকিয়ে এসে শ্রীমতী লয়াকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার কাছে কী চাও ? সত্যি বলছি প্রিন্স, খানিকক্ষণ সে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রইলো, কোনো কথা বললো না। তখন আবার মনে মনে হাড়টার কথা চিন্তা করলাম, কী চাও ? তা, কী বললে জানেন ? বললে, কী চাইবো ? বিয়ে তো ভেঙে দিয়েছো, চাওয়া-চাওয়ির ব্যাপার ত সবই চুকে গেছে ! কথাটা সে এমন সুরে বললো যে, আমার চোখে জল এসে পড়লো। কিন্তু পুরুতের কথাও তো ফেলতে পারা যায় না, তাই চোখের জল সামলে আবার হাড়টার কথা চিন্তা করে নিলাম, তারপরে বললাম, রাজকন্যা, কী চাও ? আমি তোমার ক্রীতদাস, যা আনতে বলবে, তাই এনে দেবো।

মুবু এই পর্যন্ত বলেছে, আমি আর থাকতে পারি নি, বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম, বুঝেছি রে মুবু, বুঝেছি, লয়া তোকে মুক্তো আনতে বলেছিল বুঝি ?

হ্যাঁ, প্রিন্স, মুবু বললে, ঐ যে 'বেল-অম্বির' পাহাড়, যেখানে খ্যাপা সাহেব পাথর ফাটাচ্ছে গুপ্তধন পাবার জন্য, লয়া বলেছে, সেখানকার সমস্ত মণি মুক্তো নাকি ওর বাপের, অর্থাৎ কিনা, আমাদের সর্দার-রাজার। তার থেকে একটি মুক্তো ওকে এনে দিতেই হবে। এই কথাটা শুনেই তো আমি খ্যাপা সাহেবের কাছে চাকরি নিয়েছিলাম পাথর ফাটাবার, কিন্তু একটা টুকরোও পেলাম না মণি-মুক্তোর, অথচ, যতদিন যাচ্ছে, ততদিনই পাপ চলতে থাকছে। আর পাপ না গেলে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতেও পারছিনা। আমাদের পুরুত কী বলেছে জানেন ? বলেছে, ওর মুখের দিকে চোখ চেয়ে তাকিয়ে থাকবি, যদি বেশ খানিকক্ষণ পারিস, তাহলে বুঝবি, দেবতা

শান্ত হয়েছেন, তোর পাপ কেটে গেছে। আর যদি না পারিস, তাহলে বুঝবি, এখনো তোর পাপ চলেছে। সত্যি বলছি প্রিন্স, ওর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই পারি না, ভয় করে। শত হলেও আমাদের রাজার মেয়ে।

এতদূর পর্যন্ত বলে এবার আমার কাছে মুখ নামিয়ে ফিস-ফিস করা সুরে বললে, আপনি যেন ওকে কিছুতেই বলবেন না যে আমি মুক্তো ধরতে গিয়েছিলাম। যদি ওভাবে একটা মুক্তো পাই, বুঝলেন প্রিন্স, তাহলে ওকে গিয়ে বলবো, পাওয়া গেছে তোমার বাপের মুক্তো সেই 'বেল-অস্থি' থেকে, এই নাও। ও মুক্তোটা নিয়ে তখন গলায় পরে রাজার মেয়ে সাজবে, আমারও অমনি পাপ কেটে যাবে। পুরুতকে গিয়ে বলবো, রাজার মুক্তো পেয়ে রাজার মেয়ের হাতেই দিয়ে এসেছি। ব্যস, আপনি ছাড়া এ খবর কেউ জানতে পারবেনা, কিন্তু খবরদার কাউকে কখনো বলবেন না যেন !

ওর অতি গম্ভীর স্বরের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বললাম, পাগল ! আমি বলতে যাব কেন ? আর আমি না বললে জানতেই বা পারবে কে ? কিন্তু মুবু, একটা কথা থেকে যায়। তোদের দেবতা মনে মনে জানতে পারবেন না তো ?

কিন্তু মুবুকে অপ্রতিভ করবে এমন সাধ্য কার ! উত্তর তার সাজানোই আছে। এই সহজ সরল মানুষগুলির মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে দেখছি ! বললে, কী করে জানবেন ? জানেন না বুঝি ? দেবতার মন যে পুরুতের কাছে বাঁধা থাকে !

ভ্রূ-কুঁচকে কপট বিস্ময়ে বললাম, তাই বুঝি ?

হ্যাঁ প্রিন্স। সেই হাড়। দেবতার মনের কথা পুরুত ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। আবার পুরুতের মনের কথা দেবতা ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না !

মনে মনে বললাম, আজকের ভাষায় একেই বলে 'মগজ ধোলাই'। আমার কোনো সাধ্য নেই যে ওর এই বিশ্বাস থেকে টলাই ! সুতরাং 'শুনে যাওয়া' আর 'সায়-দেওয়া' ছাড়া আমার আর কিছু করণীয় নেই

আপাততঃ। এখন পরিষ্কার হলো, চরম বিপজ্জনক জেনেও ও কেন জলের তলায় হাত দিয়েছিল ঝিনুক তোলবার জন্য। কিন্তু ও তো গেল বিষয়ের একদিক, অন্য দিকে রয়েছে লয়া। আছে লয়ার মন, লয়ার দৃষ্টিভঙ্গি। তাই এ কথা মনে হতেই মুবুকে প্রশ্ন করলাম, লয়া এখন কোথায়? মুবু এবারেও গুপ্তকথা ব্যক্ত করার মতো নিচু গলায় বলল, আপনি আজ ফিরবেন তো? তাই সকালে ওকে এনে রেখেছি আপনার বাংলোয়!

সে কী! রাজকন্যা কি এখনো আমার কাজ করবে?

মুবু কিন্তু অবাক করেই বললে, না করবে তো যাবে কোথায়?

ও রাজী হয়েছে কাজ করতে?

নিশ্চয়।

এ কথা শুনে মনে মনে একটা সমস্যায় পড়লাম বলা চলে। যাকে 'ঝি'র মতো ভেবে এসেছি, তাকে এবার মুবুদের রাজকন্যা ভেবে নিয়ে কতটুকু যে সম্ভ্রম প্রকাশ করতে হবে, তাপ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এই রকম মনের অবস্থায় মুবুকে নিয়ে তো বাংলোয় ফিরে এলাম। কিন্তু একটা কথা বলতে হবে, মেয়েটি আগের থেকে অনেক চট্‌পটে হয়েছে, বুদ্ধিমতী হয়েছে। প্রবাল-প্রাচীরের অভিযান শেষে বাংলোর বারান্দায় গিয়ে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এলো ডিম-সিদ্ধ, মাছের ফ্রাই, রুটি আর চা।

লয়ার পরণে অতি সাধারণ একটা গাউন, কেশকলাপ গুছি করে ডান কাঁধের পাশ দিয়ে নিয়ে আসা। একটু চমকেই তাকালাম। সেই লয়াকে যেন চেনাই যায় না। মার্জিত একটা রুচির ছায়া পড়েছে চেহারায়। চলাফেরায় সপ্রতিভ শুধু নয়, বেশ একটা আভি-জাত্যের ছোঁয়াও আছে। এই মেয়ে একদিন নতমুখে পায়ের কাছে বসে আমার পা টিপে দিয়েছিল সাধারণ সেবিকার মতো, এখন ভাবতেও পারা যায় না। আমি একটু হেসে বললাম, ধন্যবাদ।

মাথা একটু নিচু করে প্রত্যভিবাদন জানালো লয়া, এ ভঙ্গিও

ওর নতুন। তারপরে আরও অবাক হবার মতো ঘটনা, একটু হাসলো ঠোঁট টিপে। বললো, প্রিন্স কি আমাকে দেখে প্রথমটায় চিনতে পারেন নি ?

বললাম, 'হ্যাঁ' বলবো, কি 'না' বলবো, তাই ভাবছি।

এ 'লয়া' যেন আরেক 'লয়া'। বললে, হ্যাঁ, বেশ করে ভেবেই বলুন।

বলেই, আর দাঁড়ালো না, আমাকে হতচকিত করে তাড়াতাড়ি চলে গেল ভিতরে, রান্নাঘরের দিকে। আর তার পরমুহূর্তেই তার মেয়েলী অথচ ধারালো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, মুবু ?

মুবু বসেছিল বারান্দার প্রান্তে পা ঝুলিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই।

তারপরে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম মুবুর বদলে কাছে এসে দাঁড়ালো লয়া, বললে আপনাকে কি আরও দুটো ফ্রাই দেবো ?

না। মুবুকে কিছু দিয়েছো তো ?

একটু অপ্রতিভ, একটু লজ্জিত ভঙ্গিতেই লয় বললো, আপনার অনুমতি না নিয়েই কিন্তু ওকে খেতে বসিয়ে দিয়ে এলাম।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, বলছো কী! অনুমতির কি দরকার ? ওকে খেতে না বসিয়ে দিলেই আমি দুঃখিত হতাম। মুবু আমার বন্ধু। জানো ত ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আপনার অনুমতি না নিয়ে আরও একটা কাজ করে ফেলেছি। কাওয়াসজী সাহেবের স্লিপ নিয়ে 'চীনাম্যান্‌স্ স্টোর' থেকে কিছু কছু খাবার দাবার আনিয়ে নিয়েছি।

লজ্জিত হয়ে বললাম, ছি ছি, আমারই ত্রুটি হয়েছে। টাকা পয়সা মুবুর হাত দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আমার সমুদ্র-যাত্রায় মুবুর এমন উৎসাহ হলো যে, টাকাপয়সার কথা মুবুও আমাকে মনে করিয়ে দিতে ভুলে গেল।

লয়ার মুখখানা গম্ভীর হলো, বললো, ভুলে যাওয়া কি ওর পক্ষে

উচিত হয়েছে ? আপনাকে আমি বলবো প্রিন্স, ওকে আর এ-রকম প্রশ্রয় দেবেন না। চাকরকে চাকরের মতোই দেখা উচিত, নয় কি ? ওর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব, এটা কিন্তু ভালো দেখায় না !

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম 'লয়া' নামক মেয়েটির দিকে ! হাবে-ভাবে চলায়-ফেরায় সেই নতমুখী লাজুক 'লয়ার সঙ্গে এ লয়ার যেন কোনো মিলই নেই। এ-রকম ঝক্‌ঝকে চেহারাই তখন ওর ছিল না।

যাই হোক, ও কিন্তু এবারও বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না, চলে গেল রান্নাঘরে। ভিতরের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, শোবার ঘরখানা চমৎকার গুছিয়ে ফেলেছে লয়া। ফুলদানীতে ফুল, ফুলের নাম জানি না, রঙ একেবারে ঘোর লাল। দেখে-আসা সেই প্রবাল পুষ্পের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখেই সেদিন মনে মনে নিদারুণ তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম।

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে সিগারেট টেনে চলেছি, হয়ত আনমনে ভাবছিলাম 'লয়া' মেয়েটির অদ্ভুৎ পরিবর্তনের কথা, হঠাৎ একসময় লক্ষ্য করলাম, ধীর পায়ে কখন মুবু এসে আলগোছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে খাবারের প্লেটগুলো। একটু অবাক হয়েই বললাম, মুবু, তুমি !

বললে, হ্যাঁ কর্তা, আমি। এগুলো ধুয়ে আনি।

বললাম, কিন্তু তুমি কেন ? ও-তো লয়া—

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললো, আ ছি ছি ! আশান্তি সর্দারের মেয়ে কি কখনো এসব কাজ করতে পারে ? প্রিন্স, ও আপনার রান্নাবান্না করে দেবে। আমি করবো চাকরের কাজ।

এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, দেখ মুবু এ-বাড়ির কর্তা কে ? আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই তোমারা যে-যার বিলি-ব্যবস্থা করে নিচ্ছো ? তোমার সর্দারের মেয়ে রান্না যদি করতে চায় করুক, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি এসব কাজ করবে কেন ? অন্য লোক ডাকো ?

মুবু হাতের প্লেট চট্ করে নামিয়ে রেখে হঠাৎ আমার কাছে এসে একেবারে হাতদুটো ধরে পড়লো। অদ্ভুত মিনতির সুরে বলতে লাগলো, এ হুকুম করবেন না প্রিন্স, অন্য লোক মোটেই দরকার নেই। আমি হয়ত দুপুরটা থাকবো না। কিন্তু সকাল-বিকেল এসে সমস্ত কাজ করে দিয়ে যাবো। আর রাত্রে থাকবো। আপনার কোনো দিক দিয়ে অসুবিধে হবে না।

ওর এ-কথার ওপর আমি আর 'না' করতে পারলাম না। কিন্তু মুবুদের মতো লোকদের এই মানসিক পরিবর্তন রীতিমত ভাবিয়ে তুললো। আমি এ-দ্বীপের কেউ নই, আগন্তুক মাত্র। অথচ, যাঁরা এ-দ্বীপের কর্ণধার, কিম্বা নেতা, তাঁরা কি ভাবছেন না? আলদাব্রায় যা দেখে এলাম, এখানেও তাই। 'মুবু'রা নামে আফ্রিকান, কিন্তু সব বিষয়ে এই দ্বীপের অন্যান্য শ্রমজীবীদের সঙ্গে এক হয়ে মিশেছিল, আচারে-ব্যবহারে, রীতিতে-বিশ্বাসে, সবই ছিল এক। কিন্তু কোথা থেকে এলো সব তথাকথিত 'পুরোহিত'-এর দল। এসে, ওদের মধ্যে উগ্র-জাতীয়তার বিষ ঢুকিয়ে দিলো। তার ওপরে এলো ডঃ গ্যাব্রিয়েল টমাস। সে আধুনিক মানুষ কিন্তু তার ইতিহাস অন্বেষা পরোক্ষে আর এক ক্ষতিকারক অধ্যায়ের সৃষ্টি করলো বলে মনে হয়। 'লয়া' আশান্তি-সর্দারের মেয়ে, এ তারই আবিষ্কার, আর মুবু সেই সর্দারের ক্রীতদাসের ছেলে এ-ও তার আবিষ্কার। এ কথা জানবার পর এই দুই জনেরই মানসিকতার পরিবর্তন হলো রাতারাতি। এখন এদের অন্য কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। আমাদের দেশের লক্ষ্মৌ শহরের অভিজাত ওমরাহ-সন্তান অধুনা টাঙা-চালাকে পরিণত হলেও তার আভিজাত্য বোধ যাবার নয়। যেটুকু দেখলাম তাতে লয়ার মনেও বোধহয় গড়ে উঠেছে এইরকম এক আভিজাত্য বোধ, যা থেকে তাকে ঠেকানো যাবেনা। আর টলানো যাবেনা মুবুকে তার ক্রীতদাসসুলভ হীনমন্যতা থেকে।

কী আর করা যাবে আমার দিক থেকে? ভারাক্রান্ত মন নিয়ে

গেলাম আমার বাংলোর মালিক ও পূর্ব পরিচিত কাওয়াসজীর সঙ্গে দেখা করতে। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে যখন মুবু আর লয়ার প্রসঙ্গ তুললাম, তখন কাওয়াসজী বললেন, আমার থেকেও ইতিহাসের কথা অনেক বেশি বলতে পারবেন আমার বাবা, পঁচাশির ওপর হয়ে গেছে বয়স, হাঁটা চলা বিশেষ করতে পারেন না, চলুন ওঁর কাছে নিয়ে যাই। বাজা প্রেমকে উনি নিজে দেখেছিলেন।

চলুন।

বৃদ্ধ কাওয়াসজী উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আগ্রহের সঙ্গেই বলতে লাগলেন, ডঃ টমাস আমার কাছেও এসেছিলেন। খুব ভালো মানুষ। সাবা দ্বীপ চষে বেড়িয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। তিনি আপনার কথাও আমাকে বলে গিয়েছিলেন, আপনার সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল।

তা হয়েছিল। আমাকেও বলে গিয়েছিলেন আট্‌চেরি বোয়াণ্ডা ও রাজা প্রেমপের কথা। আপনি রাজা প্রেমপের কথা জানেন?

বৃদ্ধ বললেন, তা জানি। তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম যে! সে কি আজকের কথা? রাজা প্রেমপে যখন ভিক্টোরিয়ায় নামলেন তখন আমরা বহুলোক তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। মিশকালো চেহারা, বলিষ্ঠ নিগ্রোশরীর। যেমন হয় আর কী, কিন্তু অদ্ভুত ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। চিতাবাঘের চামড়া তাঁর কোমরে আর বুকের খানিকটা অংশে জড়ানো, মাথায়ও চিতাবাঘের চামড়ার টুকরো। তাঁর সঙ্গে জাহাজ থেকে নামলো তাঁর অনেক অনুচর, তাঁর বৃদ্ধা মা, তাঁর স্ত্রীরা আর ছেলেরা। নির্বাসন-দণ্ড মাথায় নিয়ে নেমেছিলো প্রেমপে, কিন্তু এখানে ছিলেন রাজার হালে। আমার মনে আছে, তিনি ১৯২৪ সালে 'কায়রো' বলে একটা জাহাজে করে এখান থেকে বোম্বাই যান, সেখান থেকে একেবারে খোদ ইংল্যাণ্ডে। সেখান থেকে তাঁর দেশে ফিরে তিনি আবার বসেন সিংহাসনে। তাঁর এই খবর তখনকার কাগজগুলো, এখানকার কাগজ অবশ্য, প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছেপেছিলো।

তিনি থামতে আমি বললাম, টমাসের কাছে শুনেছি, এখানেও রাজা প্রেমপে কয়েকটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন।

হ্যাঁ, কাওয়াসজী বললেন, ঐ টমাসই বলে গেলেন, তাঁদেরই একজনের গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। লয়াই নাকি সেই সন্তান। অবশ্য এসব ঐ টমাসের আবিষ্কার।

যাই হোক, আমি তো পরদিন থেকে আমার কাজ নিয়ে মেতে গেলাম। অবশ্য কাজ বলতে অফিসে যাওয়া আর ফিরে আসা। গাড়িতেই যেতাম। গাড়িতেই আসতাম। আসতে আসতে লক্ষ্য করতাম সেই পাগল-সাহেব দমদম-রকে আজও পাথর ফাটাচ্ছে গুপ্তধন ফিয়ে পাবার আশায়।

আমি ছুটির দিনে সারাদিন বারান্দায় ইজিচেয়ারটা টেনে এনে অলস হয়ে শুয়ে থাকতাম। সামনের হ্রদে ধীরে ধীরে রোদ পড়ে আসতো। বিকেলের প্রসন্ন আলোয় ঝলসেটে করতো নীল হ্রদ, আর ঠিক সেই সময় একেবারে ঘড়ির কাঁটা-ধরা নিয়মে, পায়ে-চলা পথটি ধরে ধীর পায়ে কাছে আসতো লয়া। সকালেও সে আসতো। কিন্তু তার বিকেলের আসাটাই ছুটির দিনে আমার কাছে এক অভিনব ভাবের দ্যোতক বলে মনে হতো। আমি জানি ও আসবার পরেই আসবে মুবু। এসে বলবে, না প্রিন্স, আজও 'দমদম রক' খোঁড়া হয়েছে, খোঁজ নিয়ে এসেছি 'মুক্তো' মেলে নি।

দুপুর বেলা, অর্থাৎ অবসর সময়টা, ও ঘুরে ঘুরে বেড়ায় শুধু একটি মুক্তোর খোঁজে। একটি মুক্তো এনে লয়াকে দিতে পারলে ওর নাকি 'পাপ'-এর ক্ষয় হবে, ওদের পুরোহিত বলে গেছে। এবং এই পুরোহিতদের কথা ওদের কাছে একবারে অকাট্য। সেখান কোনো যুক্তি ওদের মনে কোনো প্রভাব বিস্তারই করবে না।

যাই হোক, লয়া যখন ভোরবেলা কাজ করতে আসে, মুবু তখন ঘুম ভেঙে চুপচাপ চেয়ে থাকে ওর পথের দিকে, ও কাছাকাছি আসতে-না-আসতেই সরে যায় অন্য দিকে। এ আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি। আর কাজের দিনে যখন বিকেলে ভিক্টোরিয়া থেকে

ফিরে আসি, তখন দেখি মুবু-লয়া দুজনেই এসে গেছে বাড়িতে। মুবু বাসন মাজছে, কিম্বা ঘর মুছ্ছে, আর লয়া রান্নায় ব্যস্ত! কখনো বা ধমক দিচ্ছে মুবুকে। দিয়েই তৎক্ষণাৎ সরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। আর মুবু? যে মুবু একদিন ওকেই ধমকাতো বা মারতো, সেই মুবু এখন নিরীহ গৃহপালিত পশুর মতো চোখে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে হ্রদের দিকে। হাতেব কাজ মুহূর্তের জন্য তার বন্ধ হয়ে যায়। এক-একদিন সেই অবস্থাতেই আমি গিয়ে পড়েছি ওর কাছে, বলেছি কী বে?

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি আবাব কাজ শুরু করতো, বলতো, না প্রিন্স, কিছু না।

মাথার টুপিটা খুলে রেখে কাউচে বসে সিগারেট ধরাতাম ধীরে সুস্থে। হয়ত বা কোনোদিন ডেকে উঠতাম, লয়া?

আসছি প্রিন্স।

পরক্ষণেই চায়ের ট্রে নিযে ঘরে ঢুকতো লয়া।

ওকে দেখেই চট্ করে উঠে দাঁড়াতো মুবু, ছুটে গিয়ে ট্রে-টা হাতে নিয়ে এগিয়ে দিতো আমার কাছে। অপ্রস্তুতের মতো হেসে বলতো, আমাবই কসুর হয়ে গেছে প্রিন্স। রান্নাঘরে গিয়ে চা-টা আমারই নিয়ে আসা উচিত ছিল।

দরজার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতো লয়া। সেই দিকে একবার তাকিয়ে হেসে বলতাম, কিছু কসুর হয় নি। কিন্তু মুবু, মুক্তো মিললো তোমার দমদম রকে?

মুবু মুখ নিচু করে অপরাধীর মতো বলতো, না প্রিন্স।

কৈফিয়ৎটা আমার কাছে হলেও উপলক্ষ্যটা 'আমি' নই, সম্রাজ্ঞীর কাছে অপরাধ স্বীকার করছে যেন অপরাধী ক্রীতদাস, আর তার সেই ভাব লক্ষ্য করে দর্পিতার মতোই দরজার কাছ থেকে ভঙ্গিভরে চলে যেতো লয়া।

কিন্তু ছুটির দিনে, আমি যখন বাড়িতে, তখন বিকেলে লয়া যখন কাজে আসতো, তখন ওর আসার ভঙ্গি লক্ষ্য করে আমার কেমন যেন

মনে হতো। ওর সমস্ত দেহ-মন দিয়ে ও মুবুকে খুঁজছে। ও জানে মুবু এখন নেই এবং নেই বলেই ওর দৃষ্টি হয়ে উঠতো তৃষ্ণাতুর। অবশ্য এ-সবই আমার অনুমানের কথা।

মেয়েটি সন্ধ্যাব কিছু পরে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে বাড়ি চলে যেতো। ওর বাড়ি খুব দূরে নয়। সে আমি জানতাম। তখন ও 'রাজকন্যা' হলেও পোষাক ছিল সাধারণ। সাদা গাউন, কিম্বা কখনো বা ফিকে নীল রঙের গাউন। সাদা আর ফিকে নীল রঙ বোধ হয় খুব পছন্দ ছিল মেয়েটির। যখনই আসতো হাতে থাকতে একটা কাপড়ের ব্যাগ। আশ্চর্য, ব্যাগের কাপড়ের রঙটাও নীল। তবে ফিকে নয়, গাঢ়। ওর নিজস্ব টুকিটাকি জিনিস থাকতো তাতে।

রাত্রে সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়ারই রেওয়াজ এখানে, আমি সেরে নিতাম সকাল-সকাল। যদিও মেরী যখন ছিল আমার জীবনে, তখন এটা ঘটে উঠতো না। এক-একদিন বেশ দেরি হয়ে যেতো। সেজন্য মুবু বা লয়া কোনো কথা বলতো না, ঠায় অপেক্ষো করতো আমার জন্য।

যাই হোক, ঘরে বসে আহার পর্বের শেষে কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতাম, মুবু হয়ত মেঝের ওপর বসে ওর সেই দমদম রকের পাথর ফাটানোর গল্পই করেছে, লয়া ঢুকে যেতো ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটায়। জল ঢেলে ঢেলে সে বহুক্ষণ ধরে স্নান করতো, তার সেই জল ঢালার শব্দ শুনতে শুনতে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলতো মুবু। এটি আমার লক্ষ্য এড়াতো না। যদিও এ নিয়ে কোনো মন্তব্য ওর কাছে আমি করতাম না। চুপচাপ বসে থাকতাম দুজনে, আর লয়া নিজের মনে স্নান করতো। গতবার লয়ার বাথরুমে ঢোকবার সাধ্যই ছিল না। মুবু দেখতে পেলে তার ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসতো, হয়ত আমার সামনেই চড় চাপড়টা দিতো। আমি বাধা দিলে বলে উঠতো, আমাদের জাতের মেয়েছেলে, কখনো লাই দেবেন না? আমাদের পুরুত কী বলে জানেন? মেয়েমানুষ

আর কুকুর সবসময়ই রাখতে হয় পায়ের নিচে।

কিন্তু এবার কিছু বলার উপায় নেই মুবুর। মনে মনে এক একসময় অবাক না হয়ে পারতাম না। ভাবতাম সত্যিই অদ্ভুত মনস্তত্ব এই মুবুর। যাকে সে কুকুরের মতো পায়ের নিচে রাখতে চাইতো, তাকে সে আজ রীতিমত সম্ভ্রমের চোখে দেখছে। তাকে যে সে একসময় বিয়ে করবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল, এখন ওকে দেখে সে-কথা আর বোঝবার উপায় নেই। এমনই ওদের ওপর প্রভাব ওদের পুরুতদের। মনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে পুরোহিত কর্তৃক আরোপিত সংস্কারই ওদের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে। তথাকথিত আচার সর্বস্ব ধর্মীয় অনুশাসন সমাজ জীবনে যে কতখানি ক্ষতিকারক মুবু যেন তারই মূর্ত উদাহরণ।

স্নানের শেষে একেবারে সমস্ত প্রসাধন সেরে বাথরুমের বাইরে আসতো লয়া, আর একটা চমৎকার সৌগন্ধে ভরে উঠতো ঘরটা। ওর হাতেব ব্যাগটার দিকে আঙুল দেখিয়ে একদিন বললাম, তোমার প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিস ব্যাগে করে বয়ে আনো কেন লয়া, আমার কাছে ত অনেক 'পারফিউমারি' রয়েছে, নিতে পারো না?

কথাটা একবার নয়, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারকয়েক বলেছি। উত্তরে লয়া মুখটিপে একটু হেসে চুপ করে থাকতো, কিছু বলতো না এবং আমার প্রসাধন-দ্রব্যেও হাত দিতো না। স্নান-শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ি চলে যেতো লয়া, আর মুবু বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতো কিছুক্ষণ, তারপরে বিছানা করে শুয়ে পড়তো।

লয়া সেদিনও স্নানশেষে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েছে, পেছন থেকে ডেকে উঠলাম লয়া? ফিরে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গিমায় বললে, ডাকছেন প্রিন্স?

হ্যাঁ। শোনো?

ধীর পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে মুবু চলে গেল ঘর ছেড়ে বারান্দায়।

লয়াকে বললাম, বোসো।

বসলো। নিঃসংকোচে। ওর রীতিমত সম্ভ্রমবোধ সঞ্চারিত তখন। ওকে তখন, এই মুহূর্তে দেখে, হঠাৎ মেরীকে মনে পড়ে গেল। একদিন লয়াকে দেখে চুপি চুপি বলেছিল, কী অদ্ভুত ফিগার দেখেছো? তোমার লোভ হয় না? কথাটার মধ্যে যে মিথ্যে ছিলনা, আজ ওকে দেখে তা সত্যিই মনে হয়। তখন জড়োসড়ো হয়ে থাকতো, ভীত হরিণীর মতো চাউনি কিন্তু এখন ওর চলায়-বলায় যেন সেই দর্জিণী মেরীই ফুটে উঠেছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, দেরি করিয়ে দিচ্ছি না?

পাতলা ঠোঁটে অল্প একটু হেসে বললে, না।

বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করো?

কী আর করবো? বই-টই নিয়ে নাড়াচাড়া করি আর কী।

খুব ভালো, বললাম, খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি চলে যাও, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তোমাকে ডেকে একটু গল্প করি।

বেশ ত, ডাকলে পারেন।

একটু হেসে বললাম, যদি তুমি রাগ করো?

সে কী! আমি রাগ করবো কেন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে শেষে বলেই ফেললাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো লয়া?

কী?

বললাম, মুবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা তো অনেকদূর এগিয়েছিল, কিন্তু এখন—

বাধা দিয়ে বলে উঠলো, যা চুকেবুকে গেছে, তার কথা আর তুলবেন না প্রিন্স! মানুষ কি জীবনে ভুল করে না? আমরাও করেছিলাম।

কী ভুল? বিয়ে?

হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক কী করে সম্ভব? জানেন তো, আমার শরীরে কার রক্ত বইছে?

জানি। কিন্তু তুমি এ-যুগের মেয়ে, খৃষ্টান হয়েছো। এই

আভিজাত্যটাকেই বড়ো করে দেখলে ?

মেয়েটি শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু এ কথায় ওর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো, বললে, কেন দেখবোনা! কী পেয়েছি জীবনে ? ঝি-বৃত্তি করে জীবন কাটালাম, আর কী বলবো আপনাকে, দেখেছেন তো আমাদের জীবন ? আমার অজানা এখন কিছুই নেই। কাজে গিয়ে একটু ভুল চুক হলে মনিব পক্ষের দিক থেকে কীরকম চোরের মার পেতাম, সে তো নিজের চোখেই দেখছেন একদিন! আর সে মার খেয়েছি কার হাতে, সেই ওরই হাতে। কী বলেন ব্যাপারটাকে ? পশুর মতো জীবন নয় আমাদের ? কুকুরকেও বোধ হয় মানুষ অমন করে মারে না। এমন যখন অবস্থা, দিনরাত লাঞ্ছনার যাতনায় ভুগছি আর লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছি, এমন দিনে হঠাৎ জানতে পারলাম আমার সত্যিকার পরিচয়! আমি গরিব হতে পারি, না খেয়ে, পড়ে মরতে পারি, কিন্তু কেন ভুলবো, আমি আশান্তি সর্দার রাজা প্রেমপের মেয়ে ?

চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপরে একসময় বললাম, মুবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা উঠেছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ভালোবাসতে না ওকে ?

অপ্রতিভ হবার বা লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়বার মেয়ে লয়া আর নয়। সে আমার কথায় হেসে উঠলো, অদ্ভুতভাবে বললো, যেখানে সবসময় মারধোর চলতো সেখানে ভালোবাসা কী বেঁচে থাকতে পারে, প্রিন্স ?

বিয়ের কথা ওঠবার পরে তোমাকে ও মারতো ?

বারে! কেন মারবে না! ওকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিতো, ওদের জাতের বলে চলত সব কিছু। মেয়েমানুষকে কথায় কথায় মারধোর না করলে মেয়েমানুষ নাকি ঠিক থাকে না! এই হচ্ছে ওদের মত, বলে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমায় হেসে উঠলো লয়া।

পরের দিন। রাত্রে, খাওয়া-দাওয়ার পর স্নান সেরে লয়া ঘরে এসে বসতেই বলে উঠলাম, এই গল্প কথাটা রুটিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে

গেছে কিন্তু। রোজ আমার সঙ্গে এ রকম কিছুক্ষণ গল্প করে তারপরে বাড়ি যাবে।

রাজী। গল্প করতে আমারও খুব ভালো লাগে।

বললাম, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো লয়া? তুমি আমার কাছে এসে বসলেই মুবু বাইরে চলে যায় কেন বলতো?

কেন যাবে না! একটু যেন উত্তেজিতই মনে হলো লয়ার কণ্ঠস্বর। আপনাতে-আমাতে কথা হচ্ছে, ও এর মধ্যে থাকবে কেন? চাকর, চাকরের মতোই থাকবে।

চাকর হলেও তোমার ভূতপূর্ব, মানে, তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, সে কথা ভুলছো কেন?

একটু হেসে উঠলো, বললে, ওর সঙ্গে যে বিয়ের কথা উঠেছিল, সে কথা আপনি বা ভুলতে পারছেন না কেন?

রীতিমত চমকেই উঠলাম এ কথায়। বললাম, কী বলতে চাও?

হেসে উঠলো, বললো, কিছু না প্রিন্স, এমনি একটা কথার কথা বললাম। আপনি ইণ্ডিয়ার কথা বলুন, শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে। সেদিন একটা বইতে পড়ছিলাম—India is full of gods and temples! সত্যি?

বললাম, পড়ো বুঝি খুব?

খুব না। তবে পড়ি। ইংরেজীটা একটু রপ্ত করছি। পরীক্ষা-টরিক্ষা দেবার ইচ্ছে আছে।

কেন?

বললে, বারে! চিরকাল রাঁধুনি হয়ে কাটাবো নাকি? নিন, বলুন আপনার দেশের গল্প।

আমাদের দেশের গল্প? শুরু করলে রাত কেটে যাবে!

কাটুক রাত, আপনি বলুন।

তার মানে। সারারাত সত্যিই আমার ঘরে কাটাতে চাও নাকি? নিন্দেয় যে কান পাতা যাবে না!

সে কী। কেন? বলেই একটু হাসলো, 'সিসেস্‌ল্' আপনার

কাছে নতুন নয়। ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না এখানকার লোক!

বললাম, আমাকেই বা বিশ্বাস করছো কী করে? আমার যদি কোনো কুমতলব থাকে?

খিলখিল করে হেসে উঠলো লয়া, বললো, খুব বললেন যা হোক! আর তাতেও ভাবনা নেই, পাহারাদার ঠিক আছে! আমার পিছনে জানলায় চেয়ে দেখুন! চুপি চুপি মুখ বাড়িয়ে সব শুনছে!

কে! মুবু?

হ্যাঁ।

মুহূর্তে কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো ঘরের আবহাওয়া, কেমন যেন বিরক্তিতে ভরে গেল সমস্ত মন। চট করে উঠে বাইরে বারান্দায় চলে গেলাম, ডাকলাম মুবু?

তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এলো, বললে প্রিন্স?

বললাম, তোমাকে ঘরের বাইরে আসতে বলেছে কে?

কেউ না।

জানালায় মুখ বাড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলে কেন?

মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মুবু। ওর ঐ অপরাধীর ভঙ্গি দেখে আরও রাগ হয়ে গেল। বললাম, তুমি কি ভাবো, তোমার প্রেমিকার সঙ্গে আমি প্রেম করছি?

কথাটা শুনে ওর সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠলো ভয়ে, চাপা ভয়ার্ত এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো, ও-কথা বলছেন কেন? ওর ওপর কোনো ভাবে কোনো অধিকার আমার আছে কি?

এর উত্তরে আমি কিছু বলবার আগেই দরজার কাছ থেকে ভেসে এলো লয়ার ধারালো গলার স্বর, এই যদি হবে, তবে ফেরো কেন আমার পিছনে পিছনে ছায়ার মতো! যেখানে 'আমি' সেখানেই 'তুমি' এসে হাজির হও কেন? প্রিন্সের এইখানে চাকরের কাজ নিতেই বা কে বলেছিল তোমাকে! হিংসুটে, ভণ্ড কোথাকার!

বলতে বলতে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো লয়া। যদি সত্যিই মনে করে থাকো আমি তোমাদের জাতের সর্দারের মেয়ে, তোমাদের রাজা প্রেমপের মেয়ে, তাহলে যেমন করে হোক, আমার হাতে দেবে আমার বাপের সেই হারানো মণিমাণিক. অন্তত একটি মুক্তো! তাহলে বুঝবো, তোমার কথা সত্যি, কোনো মনগড়া আজগুবী কল্পনা নয়, সত্যিই আমাকে রাজার মেয়ে মনে করো তুমি, তোমার মনে আমাকে নিয়ে আর কোনো কুশ্রী কামনা নেই!

বলে আর দাঁড়ালো না, শুধু আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠলো, আমি এবার চললাম প্রিন্স, বঁজুর! হাতে তার সেই নীল ব্যাগ, সিঁড়ি দিয়ে নেমে পায়ে-চলা পথটি ধরে তার বাড়ির দিকে চলে গেল লয়া। আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত বারান্দায় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা দুটি প্রাণী।

নীরবতা ভাংগলো মুবুই প্রথম। বললে, কাল থেকে আর আসবো না আমি!

বললাম, দূর পাগল! ওর কথায় কান দেয় নাকি!

ছোটছেলের মতো হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো মুবু। বললে, প্রিন্স, আমার ছোট মন নয়, ছোট ভাববেন না আমাকে! আপনারা কথা বলছিলেন, আমি আপনাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছিলাম সত্যি, কিন্তু সেটা হিংসে নয়? আমি আপনাদের হিংসে করিনা প্রিন্স!

তার মানে!

একটু সামলে নিয়ে মুবু বললো, ওকে মুক্তো আমি এনে দেবোই, না-দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই! কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও আমাকে ভুল বুঝলো প্রিন্স?

ওর হাত ধরে বললাম, কী ভুল বুঝলো বলো তো? এসো ঘরের মধ্যে।

না। বারান্দার এই আবছা আলো-আঁধারেই ভালো। প্রিন্স, ও তোমাকে ভালবাসতে শুরু করুক, এই আমি চাই। কথায়

আবেগে ও নিজের অজান্তেই বোধ হয় 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এলো। কিন্তু আমার তাতে আপত্তি ছিল না, বরং ভালোই লাগলো ওর এই অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ শুনে। আমি ওর হাতটা ধরে মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলাম, এসব আবোল তাবোল কী বলছো! কী করে তোমার মনে এলো এ অদ্ভুত কথা!

মুবু গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি ইণ্ডিয়ার প্রিন্স, আর ও-ও আমাদের রাজার মেয়ে, যাকে বলে 'প্রিন্সেস', রাজকন্যা, তোমাদেরই তো মিলন হওয়া উচিত!

হো হো করে হেসে উঠলাম। ও আহত হয়ে বললে, তুমি হাসছো? হেসোনা, আমার জীবনে সব থেকে বড়ো এই সাধ, ওর উপযুক্ত লোককে ও ভালবাসুক, দেখে যেন যেতে পারি।

কোথায় যাবে?

আফ্রিকায়। আমাদের আসল দেশ, যেখান থেকে এসেছিল আমার পূর্বপুরুষ। কিন্তু তার আগে ওর হাতে মুক্তো তুলে দিতে হবে! না দিয়ে আমার উপায় নেই! প্রিন্স?

কী?

আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো, ও কীরকম মেয়ে জানো? কাউকে না ভালবেসে, ও থাকতে পারে না!

কী করে জানলে?

আমি জানি। প্রিন্স, ওর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখেছো? অমি মুখ তুলে সরাসরি তাকাতে পারি না। শুধু দূর থেকে লক্ষ্য করি। কী গভীর চাউনি বলো তো, যেন মানুষের বুকের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়!

কে জানে! আমি দেখি নি।

কিন্তু আমি দেখেছি! আশ্চর্য এক কণ্ঠস্বরে মুবু বলতে লাগলো, আমার কাছাকাছি ও যখন ছিল, আমার দিকে এক এক সময় বড়ো বড়ো চোখ তুলে অদ্ভুত কোমল দৃষ্টিতে তাকাতো! ওর বাঁ চোখের তারার পাশে একটি ছোট্ট তিল আছে, তুমি দেখেছো প্রিন্স?

দেখে, ওর চোখের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারবে না! ওর সেই চোখ তুলে অমন করে তাকানো, ও-ই হচ্ছে ওর ভালবাসার চাউনি। ঐ ভাবে চোখ চেয়েই ও ভালবাসতে শুরু করে! আর তারপরে দেখতে দেখতে ওর চোখের কোণ দুটো লাল হয়ে আসতে থাকে। আজ আমি দেখেছি প্রিন্স, তোমার সঙ্গে যখন ও কথা বলছিল, ওর চোখে সেই ভালবাসার চাউনি ফুটে উঠেছিল! হিংসে নয়, এ আমাব আনন্দ। মনে হচ্ছে, মুক্তি আমি পাবো! তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছে, এইবার আমাকে ভুলতে পাববে। আমি ক্রীতদাসের ছেলে, আমাকে ভালবাসা রাজার মেযের পক্ষে অপবাধ, গুরুতর অপবাধ, আমাদের পুরুত আমাকে বারবার ও-কথা বলে সাবধান করে দিয়ে গেছে!

রেখে দাও পুরুতদের কথা! বলে উঠলাম, যাব কথা হচ্ছে তাব কথাই বলো। ও তাহলে তোমাকে ভালোই বাসতো?

মুবু বললো, নইলে অমন করে ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো কেন?

বললাম, তুমিও ওকে ভালবাসতে মুবু।

উত্তর দিলো, হ্যাঁ, লোকে যেমন তাদের হাঁস-মুরগীকে ভালবাসে!

বলেই আমার কাছ থেকে সরে গেল একটু দূরে। বললো, প্রিন্স, আমি আজ চললাম! দমদম রকের সেই পাগলা সাহেবেব কাছে, আবার যাবো। মুক্তো যদি সত্যিই পাই?

ও সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে দেখে পিছন থেকে ডেকে বললাম, এই রাত্তিরবেলা যাবে কেন? আর যাবেই বা কেমন করে?

হেঁটে। কিন্তু বাধা দিয়ো না, আমাকে যেতেই হবে প্রিন্স।

বলে, আর দাঁড়ালো না, একেবারে ছুটে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

সকালে আমার কাজের তাড়া থাকে। লয়া আসতেই বললাম, মুবু কাল রাত্তিরেই চলে গেছে, জানো?

থমকে দাঁড়ালো, বললো, তাহলে ওর কাজগুলো করবে কে?

বাসন মাজার কাজ আমি পারবো না।

লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ছি ছি! এ তুমি বলছো কী? আমি কাওয়াসজীকে বলে এলাম, এখুনি দুধ দোকানের একটি লোককে উনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন!

একটু অবাক হয়েই আমার দিকে ও আকালো। বললো, ঘুম থেকে উঠেই কাওয়াসজীর কাছে ছুটতে হলো! আবার তা-ও এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে? আমি কি সত্যিই ও কাজটা করতাম না নাকি? আপনার কাজ বলেই করতাম, অন্য কারণে নয়।

বলে, ও চলে যাচ্ছিল দেখে বলে উঠলাম, গিয়ে কিন্তু আমার লাভই হয়েছে। সেই ডঃ টমাসকে মনে আছে? গ্যাব্রিয়েল টমাস? তিনি কাওয়াসজীকে চিঠি দিয়েছেন। হয়ত শীগ্‌গিরই আবার আসতে পারেন। লোকটি ভালো, আবার দেখা হলে খুশিই হবে। ও কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল!

তারপরের দিনের ঘটনা। এ-ও সকালবেলা। এ-দুদিন ধরে সত্যিই মুবুর আর দেখা সেই, কোনো খোঁজও পাইনি তার। অবশ্য তেমন করে খুঁজলে কি আর পেতাম না? 'দমদম রক'-এ গেলেই হয়ত দেখতে পেতাম পাগল সাহেবটার সঙ্গে সঙ্গে সেও পাথর কাটতে আবার লেগে পড়েছে।

কিন্তু যাবো কখন? হঠাৎ কাজের চাপও পড়েছিল। লয়া আমার খাবার সময় কাছে এসে দাঁড়ায়, আমার অবশ্য তাড়া থাকে, কোন ক্রামে খেয়ে দেয়ে নিয়েই অফিস থেকে পাঠানো সেই আমাদের পুরোনো মরিস গাড়িটাতেই উঠে পড়ি। কিন্তু আজ মনে হলো, একটু দেরি করে অফিসে গেলেই বা আমাকে ধরছে কে? না হয় ড্রাইভারকে ভাগিয়ে দিলাম। বাস ধরে যেতে এখন আমি পারবে বলে মনে হয়! আধঘণ্টা অন্তর অন্তর আজকাল বাস যাচ্ছে ভিক্টোরিয়ায়। যে কোনো একটা ধরে অফিসে গিয়ে পৌঁছলেই হলো! বললাম, বোসো লয়া, ধীরে সুস্থে খেতে খেতে তোমার সঙ্গে

গল্প করি। ড্রাইভারটিকে শুধু চলে যেতে বলে এসো।

ও আমার নির্দেশ পালন করে একটু পরেই ফিরে এলো। টেবিলের কাছে এসে আমার সামনেই বসলো, বললো, এই ক্যাবেজ-স্যুপটা আপনি ভালবাসেন। আর একটু নেবেন? আনবো?

না। তুমি চুপ করে বসে থাকো দেখি।

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম, ওর বাঁ চোখের তারার কাছে কোথায় আছে তিল! আমাকে বার বার তাকাতে দেখে আমার চোখের দিকে একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো স্থির হয়ে। মুখখানা হয়ে গেল আরক্তিম, একটু হেসে বললে, কী দেখছেন?

কিছু না! বললাম, আমি চলে যাবার পর কী করবে?

তেমনি হাসি মুখেই বললে, খাবো।

আমাব সঙ্গে বসে খেলে হতো না?

না।

না কেন?

সে আপনি বুঝবেন না।

বললাম, বেশ। তারপর কী করবে?

বাড়ি যাবো।

গিয়ে?

শুয়ে শুয়ে বই পড়বো, আর নয়ত সেলাইয়ের কাজ করবো। যেটা ভালো লাগে।

আজ পড়া বা সেলাইয়ের কাজ বাদ দিলে কেমন হয়?

হেসে উঠলো, বললো, কী করতে বলেন ওর বদলে? আপনার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় যাবো? আফিসে?

না। আফিস আজ কামাই করবো। এসো সারা দুপুর আজ গল্প করে কাটিয়ে দেই। কী, রাজী?

আমার চোখের দিকে তাকালো, পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিয়ে টেবিলে আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে কী যেন ভাবতে

লাগলো নিজের মনে, তারপরে বলে উঠলো, খুশি হবেন আপনি ?

নিশ্চয়ই।

বেশ। রাজী।

দুপুরে বিছানায় এসে আরাম করে শুয়েছি, ও কিছুক্ষণ পরে এসে বসলো একেবারে শিয়রের কাছে, বললো, আপনার চাকরের কোনো খবর জানেন।

না ? দুদিন ধরে তার তো কোনো খবরই নেই ?

আমি পেয়েছি। আমার পাড়ার একটি ছেলে বেল-অম্বি তে কাজ করে। সে এসে বললে, খুব পাথর ফাটাচ্ছে আর গর্ত খুঁড়ছে একেবারে পাগলের মতো! সাহেবের বারণও নাকি শুনছে না। একেবারে মরিয়া। মুক্তো নাকি তার চাই-ই!

খবরটা শুনে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। মুবুর পক্ষে সবই সম্ভব। সমুদ্রের খাড়িতে আমাদের বেড়ানোর কথা মনে পড়ে। খপ করে জলের তলায় হাত দিয়েছিল ঝিনুক তুলবে বলে। সে যে কী সাংঘাতিক বিপদের কাজ, মনে করলে এখনো বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে। আমি বাধা দেওয়ায় সে কাজ ওর হয়নি বলে আবার জুটেছে গিয়ে ঐ পাগল সাহেবের কাছে। পাগলের সঙ্গে পাগল হয়ে মুবু যদি আবার মুক্তো খুঁজতে শুরু করে থাকে তো, অবাক হবার কিছু নেই।

শিয়রে, বালিশের পাশে পড়ে আছে লয়ার হাতখানা, ধীরে ধীরে আমর হাতটা ওর হাতের ওপর রাখলাম। ও কিন্তু হাতটা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিলো না।

লয়া ?

কী প্রিন্স ?

তুমি তো ওকে জানো, কেন মুক্তো খুঁজে আনতে বললে ? কারণটা কী ?

অদ্ভুতভাবে হাসলো লয়া, বললে, লোকে বিশ্বাস করে না আমি রাজা প্রেম্পের মেয়ে। বলে, রাজার মেয়ে তো লোকের বাড়ি

রাঁধুনীগিরি করিস কেন? দেখুন তো প্রিন্স, রাজা প্রেমপের সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে নির্বাসন দিয়ে ছিল না এই দ্বীপে? তার টাকাপয়সা থাকবে কী করে? যে সব মুক্তো টুক্তো ছিল, তা ও কেড়ে নিয়ে লুটেরারা ঐ বেলঅস্থির দমদম রকের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল।

কে বলেছে তোমাকে এ কথা?

কেন, আপনার চাকর? ঐ যে সাহেবটি এসেছে, একটি কাগজ দেখে দেখে গর্ত খুঁড়ছে ওখানে আবার মুক্তো খুঁজছে, সেই নাকি বলেছে এ সব কথা!

ওর হাতটা এবার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, তা হবে।

তারপরে তাকালাম ওর মুখের দিকে। মুখখানা একটু নামিয়ে এনে বললে, কী দেখছেন?

তোমার চোখ।

লজ্জার একটি আরক্ত আভাসে ভরে গেল সমস্ত মুখ, আমার হাতের মধ্যে বন্দী ওর হাতখানায় মৃদু টান দিয়ে বললাম।

আঃ? ছাড়ুন।

বললাম, যদি না ছাড়ি?

আমার চোখের দিকে একবার তাকালো। তারপরে মুখটা নামিয়ে মৃদু গলায় বললো, আমাকে···আমাকে বিয়ে করবে প্রিন্স?

এই কথাটা বলার সময় ওর কণ্ঠে যেন জাদু ফুটে উঠলো। সম্ভবতঃ তারই প্রভাবে আমি সম্মোহিতের মতো বললাম, তার আগে বলো আমাকে পছন্দ করেছো তুমি?

আবার মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে, ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসির রেখা, কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললাম, কবে থেকে?

তুমি ফিরে আসবার আগে থেকে।

সে কী!

লয়া আমার বুকে মুখ রেখে বলতে লাগলো, তুমি আসছো এই

খবর পেয়ে কাওয়াসজী ডেকে পাঠালেন আমাকে, আর তোমার চাকরকে। তোমার চাকর আমাকে কী বললো জানো? বললো, প্রিন্স আসছে। ওকে তুমি পারো তো ভালোবেসো, বিয়ে করো।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলাম, মুবু! মুবু বলেছে?

হ্যাঁ, লয়া উত্তর দিলো, সে বললে, ও-ও ইণ্ডিয়ার প্রিন্স, তুমিও আমাদের রাজার মেয়ে। বিয়ের উপযুক্ত পাত্রপাত্রী।

চুপ করে রইলাম। খোঁপা ভেঙ্গে সমস্ত চুল পিঠ ভরে এলিয়ে গেছে। সেই অলকগুচ্ছ নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ একটা সন্দেহ হতেই আমর বুক থেকে ওর মুখখানা দুহাতে জোর করে তুলে ধরলাম, সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, একী, তুমি কাঁদছো!

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছতে মুছতে হাসি টেনে আনলো ঠোঁটের কোনে, বললে, ভেবোনা এ আমার একটা রোগ। যখন তখন কান্না পায়। নিজেই বুঝতে পারি না এর কারণ কী!

তারপরে, আমি অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে লয়া বলে উঠলো, কী দেখছো অমন করে?

বললাম, তোমার বাঁ চোখের তারার পাশে একটা তিল আছে, সেই তিলটাকে দেখছি!

মুহূর্তে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখ, মনে হলো সমস্ত রক্তকে যেন শুষে নিয়েছে ওর মুখমণ্ডল থেকে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ধরলাম ওকে শক্ত করে, ডেকে উঠলাম, লয়া!

আবার তেমনি ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে এনে লয়া বললো, কিছু না প্রিন্স, এ-ও আমার এক রোগ! বুকের মধ্যে যে ঘড়ির কাঁটার মতো জিনিসটা ধুক ধুক করে নড়ছে, মাঝে মাঝে মনে হয় ওটা বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় হয়, এমন সময় দরজায় বেজে উঠলো ঘন ঘন করাঘাত। লয়া তাড়াতাড়ি উঠে সরে গেল একপাশে, আমি

সাড়া দিয়ে ধীরে সুস্থে দরজা খুলে দিয়ে দেখি, কাওয়াসজীর দোকানের একটা লোক, তার হাতে কাওয়াসজীর পাঠানো একটা স্লিপ। তাতে লেখা, 'অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে, অবশ্য অন্য গাড়ি, ড্রাইভার নতুন লোক, তাই আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার বাংলো ঠিক চিনতে পারেনি, তাই একে পাঠালাম, পত্র পাঠ চলে আসুন, দেরী করবেন না। খুব নাকি জরুরী!'

অবাক হলাম। ভাবলাম, কী এমন জরুরী কাজ থাকতে পারে অফিসের, যে একেবারে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে!

কী হয়েছে!

অফিস!

এখুনি?

তাড়াতাড়ি পোষাক টেনে নিয়ে পরতে পরতে লয়াকে বললাম, হ্যাঁ, জরুরী তলব!

চা খেয়ে যাবে না?

না। ঘুরেই আসি। তুমি বাসায় থেকো।

অফিসের ছুটি হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণে, শুধু হেড ক্লার্ক আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, বললেন, আমি গাড়ি পাঠিয়েছিলাম।

কেন? বড়সাহেবের এত্তেলা এসেছে বুঝি? আবার কোনো দ্বীপে পাঠাতে চায়?

আজ্ঞে, আলদাব্রায় আবার লোক পাঠাতে হতে পারে। তবে আপনি সবে ঘুরে আসছেন, তাই আপনাকে না, অন্য লোককে পাঠাবে বলে মনে হয়!

রীতিমত বিরক্ত হয়েই বলে উঠলাম, তবে কী জন্য?

রাগ করবেন না স্যর! একটা লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো অফিসে, রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে, তার মুখ দেখে তাকে চিনতে পারছিলাম না। কোনরকমে লোকটি যখন তার নাম উচ্চারণ করলো তখন তাকে চিনতে পারলাম। মুকু।

মুবু!

হ্যাঁ। আপনাকে খুঁজছিল। অফিসের সবাই ছুটে এলো, আনা হলো ডাক্তার। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা!

মনে হলো আমার সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপছে! বললাম, তার মানে!

বললেন, আমার সঙ্গে হাসপাতালে চলুন। মৃতদেহ আপনার জন্যই রাখা আছে।

অতিকষ্টে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, মুবু মারা গেছে!

হ্যাঁ। সে একটা জিনিস দিয়ে গেছে আপনাকে দেবার জন্য। এই নিন।

বলে পাতলা কাগজের একটা মোড়ক তুলে দিলেন আমার হাতে। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, এক ফোঁটা চোখের জলের মতো নিটোল একটি মুক্তো!

হাসপাতালের প্রাঙ্গণে কালো একটা কম্বল দিয়ে আগাগোড়া ঢেকে রেখেছে ওকে। মুখের কাছ থেকে আবরণটা সরিয়ে শেষবারের মতো দেখে নিলাম। ডান হাতে তখনো ব্যাণ্ডেজ, ডান বাহু থেকে গলা আর ঘাড় পর্যন্ত জায়গাটা তখনো নীল হয়ে আছে। হাত, বুক মুখ, সব ফ্যাকাশে। দেহের সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে চুমুক দিয়ে পান করে নিয়েছে কোনো দানব। কিন্তু তবু মুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তির ভাব। নিমীলিত চোখের পল্লবে, ঠোঁটের কোনে এক অপরূপ তৃপ্তির আবেগ যেন ফুটে রয়েছে এখনো! মনে হলো, শোকের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ওর এই পরম প্রসন্নতার অপমান করবার আমি কে?

হেড ক্লার্কের কাছে গিয়ে বললাম, কী হয়েছিল?

তিনি বললেন, সকালে একদল ডুবুরী গিয়েছিল নৌকো নিয়ে সায়া-ড্-মাল্‌হা-ব্যাঙ্কে মুক্তোর খোঁজে, তাদের সঙ্গে কী করে যেন জুটে গিয়েছিল মুবু। নিশ্চয়ই ওদের কারুর সঙ্গে আলাপ ছিল,

নইলে ওদের সঙ্গী সে হলো কেমন করে? আমরা তো জানতাম দমদম রকে পাগলা সাহেব ফ্রীম্যানের সঙ্গে সে মুক্তো খুঁজে বেড়াচ্ছে! সে না পেয়েই বোধ হয় সে ডুবুরীদের সঙ্গ ধরে থাকবে। সায়া-ভ্য-মাল্হ-ব্যাঙ্কের জলের তলায় হঠাৎই হাত দিয়ে সে মুক্তো তুলতে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ডানা বন্ধ করে ফেলেছে ঝিনুক, ফলে আঙুল কাটা গেল। কিন্তু তাতেও ভ্রুক্ষেপ নেই, অন্য হাত দিয়ে পাথর ঠুকে ঠুকে ঝিনুকটা ভেঙ্গে সে ঠিক বার করে নিয়েছে মুক্তো! কিন্তু কোনো কোনো ঝিনুক যে বিষাক্ত হতে পারে, এটুকু জ্ঞান কি তার ছিলনা? দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল বিষের ক্রিয়া! একে বিষ, তার ওপর কাটা আঙুল থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরা, ও যে অফিস পর্যন্ত আসতে পেরেছে, এটাই ওর অসাধারণ শক্তির পরিচয়! কিন্তু কী ভয়ানক লোক দেখুন, একটি মুক্তোর জন্য জীবনটাই দিয়ে দিলো!

বললাম, লোকই বটে!

সমস্ত কাজ শেষ করে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। দরজার কাছে কাওয়াসজীর দোকানের সেই লোকটা বোধহয় কাওয়াসজীর নির্দেশেই এখানে অপেক্ষা করছিল, শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারেনি, ঘুমে ঢলে পড়েছে। আমি তাকে পাশ কাটিয়ে একেবারে সরাসরি চলে গেলাম শোবার ঘরে। টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া, আর আশ্চর্য, আমার বিছানায় পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে আছে লয়া!

ওর ঐ আরামে-শোওয়ার ভঙ্গি দেখে কেমন যেন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মন। বিরক্ত হয়ে ওকে তাড়াতাড়ি ডেকে তুললাম, লয়া?

আমার বিরক্তি ও লক্ষই করেনি, বিছানা থেকে উঠে আলস্য ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে লীলায়িত ভঙ্গিতে বলে উঠলো, কী?

ওর হাতে তুলে দিলাম সেই মুক্তোটা, বললাম, মুবু পাঠিয়ে দিয়েছে।

মুক্তোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ও যেন

বিশ্বাসই করতে পারছেনা সবকিছু ! বললো, সত্যি পাঠিয়েছে !

হ্যাঁ।

দমদম রক্ থেকে !

তা যেখান থেকেই হোক, তুমি তো এই ই চেয়েছিলে ? ভালো-করে তুলে রাখো, এই তার অন্তিম দান !

মানে !

মানে শুনবে ? মুবু মারা গেছে।

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপরে একসময়ে বলে উঠলো, কী করে মারা গেল ?

সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত পারলাম না বলতে। শুধু বললাম,ঐ মুক্তোর জন্যই।

সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু গেল কেমন করে ?

ওর চোখের সেই তিলটির দিকে তাকিয়ে বললাম, সাপের কামড়ে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর এলো, ও।

চোখে জল এলো না, গলা কাঁপলো না, মুবুর মৃত্যু ওর কাছে যেন কোনো ঘটনাই নয়। সত্যিই অদ্ভুত লাগছিল ওর আচরণ ! যেন কিছুই হয়নি, এমনি সহজ ভাবে ও টেবিলে আমার খাবার সাজিয়ে দিতে লাগলো। বিশ্রী লাগছিল। সবটাই যেন বিতৃষ্ণায় ভরা। বললাম, থাক। খাবার আর সাজাতে হবেনা। রাত্রে আর খাবো না।

কেন ?

ভালো লাগছে না।

কাছে এসে বাহুমূল স্পর্শ করে বললো, অসুখ করবে না ?

মেরী ফ্রি ম্যান যাকে বলেছিল লোভের বস্তু, সেই লয়াকে দেখে তখন বিরক্তি আর ঘৃণায় সমস্ত শরীর যেন ঘিনঘিন করছিল, অন্যদিকে সরে গিয়ে বললাম, তুমি বাড়ি যাও।

আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপরে বললো, না। এত রাত্রে আমি যেতে পারবো না। আমি থাকবো।

থাকো।

বলে চলে গেলাম পাশের ঘরে। সোফাকাউচের আশ্রয়ে। রাত কাটতে লাগলো। সত্যি কথা বলতে কী, সারা রাত আর সাড়াশব্দ পাইনি লয়ার, অঘোরে ঘুমিয়েছে নিশ্চয়।

মুবুর খবরের সঙ্গে সঙ্গে হেড ক্লার্ক আর একটি খবর দিয়েছিলেন। বড় সাহেব নাকি এসেছেন। তাঁর বাংলোতে আছেন, অফিসে অবশ্য আসেন নি, তবে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আলদাব্রায় আবার গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে কেন? আবার কি লোক পাঠাতে হবে নাকি?

ওই কথাগুলো সারা রাত আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাই ভোর হতে না হতেই ছুটে গিয়ে ধরলাম ভিক্টোরিয়া যাবার প্রথম বাস। গেলাম একেবারে বড়োসাহেবের বাংলোয়। তিনি উঠে বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। কোনো ভূমিকা না করে বলে উঠলাম, আলদাব্রায় আবার লোক পাঠাবার দরকার হয়েছে বুঝি? আমাকেই পাঠান! আমিই যাবো।

সাহেব বললেন তুমি গেলে তো ভালোই হয়। কিন্তু সবে এলে স্ট্রেন পড়বে না? এখন যা অবস্থা, অন্ততঃ বছরখানেক থাকতে হবে, তার আগে আর ছুটি নেই।

বললাম, তা হোক। এখানে আর একমুহূর্ত ভালো লাগছেনা।

বড়োসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন, ব্যাপারটা কী? হঠাৎ আবার ভালো লাগছে না কেন? আমি তো এসেই শুনলাম, তোমার শরীর মন দুই-ই ভালো আছে, এমনকি স্থানীয় এক লেডিকে বিয়ে করে তুমি হয়ত এখানেই সেট্‌ল্ করে ফেলবে!

এ আজগুবী খবরটা আপনাকে দিল কে?

খবর দেওয়ার লোকের অভাব? বড়ো সাহেব বললেন, কিন্তু যাক্, সত্যিই তুমি যেতে চাও? এখানকার কোনো বাঁধনই কি তোমাকে বাঁধতে পারেনি? ভেবে বলো।

বললাম, ভেবেই বলছি। আমাকে আপনি এখান থেকে যেখানে খুশি সেখানে পাঠিয়ে দিন, আমি সানন্দে রওনা হবো, এবং এখুনি।

বড়ো সাহেব বললেন, বুঝতে পেরেছি, তোমার সার্ভেন্টটির মৃত্যু তোমাকে মুষড়ে দিয়েছে।

আপনি শুনেছেন সব?

সব শুনেছি। তোমার লয়ার গল্প পর্যন্ত। আই সে, মেয়েটা সত্যিই কোনো রাজকন্যা নাকি?

তাই তো শুনেছি।

দেখতে শুনতে নাকি ভালো? একেবারেই নিগ্রোদের মতো নয়?

বললাম, অথচ ওর বাবা রাজা প্রেমপে তো নিগ্রোই ছিলেন।

তাহলে?

বললাম, এখানকার কোনো ক্রিয়োল মেয়েকে বোধহয় বিয়ে করছিলেন রাজা প্রেমপে। তাই—

বাধা দিয়ে বড়ো সাহেব বললেন, বুঝেছি। কিন্তু তুমি? তোমার কি—

কথাটা শেষ না করেই আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললাম, আমার কিছু নয় স্যর, যা ভাবছেন তা নয়। আমার বরং বিতৃষ্ণা জাগছে মেয়েটাকে দেখে। আই হেট্ হার!

হোয়াই?

সে সব কথা এই মুহূর্তে বলতে ভালো লাগছে না। আমাকে মাপ করবেন।

বড়ো সাহেবের মুখখানা গম্ভীর হলো, কী যেন ভেবে নিলেন তিনি, তারপরে বললেন, আলদাত্রা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি বরং দেশে ফিরে যাও।

দেশে!

হ্যাঁ। বোম্বাই। ওখানকার ম্যানেজার অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে এখন হাসপাতালে। কতদিনে সারবে বলা যাচ্ছে না। আমার

মনে হয়, তুমি গিয়ে ওর চেয়ারে বোসো আমিও কিছুদিন পরে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দেবো।

তবে হ্যাঁ, এখন বোম্বাইতে গিয়েই থাকো, স্যুট্ করে আবার কলকাতায় পালিয়ো না যেন! তোমরা বাঙালীরা বড্ড 'হোমসিক'।

কোনো উত্তর দিলাম না। দেশে যাবার একটি জাহাজ তখন বন্দরে অপেক্ষা করছিল। সেই জাহাজে জায়গা পেতে কোনো অসুবিধে হলো না।

যাবার আগে সবার সব পাওনা মিটিয়ে দিলাম। আমি যে চলে যাচ্ছি, এ যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না লয়া! বললে, তুমি সত্যিই যাচ্ছো প্রিন্স?

হ্যাঁ।

কবে আসবে?

ভগবান জানেন।

আর দেখা হবে না?

না।

কেন?

বলতে বলতে ওর চোখ ছলছল করে এলো। মনটা যে একটু নরম না হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু ওর চোখের জল আমাকে আবার বিরূপ করে তুললো ওর প্রতি।

সত্যি কথা বলতে কী, জাহাজে উঠে যার কথা সব থেকে বেশি মনে পড়ছিল, সে লয়া নয়, সে মুবু। মুবু যে এমন করে হঠাৎ চলে যাবে, এ আমি ভাবতে পারিনি! একটি মুক্তোর জন্যে! একটি মেয়ের একটি খেয়াল, তার প্রাণ এভাবে নেবে, এটা কে অনুমান করতে পেরেছিল।

দেশে যাবার যে জাহাজটিতে উঠেছিলাম, সেটি সোজা বোম্বাই যাওয়ার জাহাজ নয়, থামলো গিয়ে কোচিন বন্দরে। এইখানে নেমে, ট্রেন ধরে আবার ট্রেন বদলে অনেক কাণ্ড করে বোম্বাই গিয়ে

পৌঁছলাম। আমাদের অফিসের সংলগ্নই কটি ফ্ল্যাট ছিল। এইরকম আসা যাওয়া করা অস্থায়ী কর্মচারীদের জন্য। ফিরোজ সাহ্ মেটা রোডের কাছে 'গানবো'-স্ট্রিটের আস্তানায় গিয়ে ওঠা গেল। আমার বড়োসাহেব বলেছিলেন, 'স্থট করে আবার কলকাতায় পালিয়ো না যেন, তোমরা বাঙালীরা বড্ড 'হোম-সিক!'

কথাটায় গুরুত্ব দেইনি, কিন্তু বম্বে পৌঁছনোর পর সত্যিই মন কেমন করতে লাগলো। প্রথমবার মনে হলো, চিঠি দিই তারপরে মনে হলো, ট্রাঙ্ক কল্ করি। কিন্তু 'কী করবো কী করবো' ভাবতে ভাবতে কোনোটাই করা হলো না। সপ্তাহখানেক বোম্বাইতে কেটে যাবার পর মনে হলো, চিঠি, টেলিফোন, কোনোটাই করে দরকার নেই, একেবারে স্বশরীরে গিয়ে হাজির হই বাড়িতে। আমাকে দেখে ওরা বোধহয় ভূত দেখার মতো চমকে উঠবে! কিন্তু বড়োসাহেব এসে না পড়া পর্যন্ত আমিই বা যাই কী করে? আমি যাঁর বদলিতে কাজ করছি, তিনি হাসপাতালে শুয়ে, দু মাসের মধ্যে কাজে যোগদানের মতো তাঁর অবস্থা নেই, সুতরাং কাকে আমার জায়গায় 'বদলি' রেখে আমি কলকাতায় রওনা হবো?

সুতরাং যাওয়া হলো না। তারপরে বড়োসাহেব যখন দু মাস পরে বোম্বাই ফিরে এলেন, তখন আমার আর কলকাতায় যাওয়ার স্পৃহা রইলোনা। এবার হিসেব মতো আমার সিচেলাসে ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু বড়োসাহেব অতো কাজের ঝুঁকি নিতে রাজী নন। বললেন, অফিসের ম্যানেজার সেরে উঠে হাসপাতাল থেকে আসুক, তখন তুমি যেও। এখন, কে সামলাবে এতো কাজের ঝামেলা। কালচক্রে তখন অফিসের কাজও বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর। এবং দেখতে দেখতে এমনই বেড়ে গেল যে হাসপাতাল থেকে ম্যানেজার এসে যোগদান করলো ছ-মাস পরে, কিন্তু বড়োসাহেব তবু আমাকে ছাড়লো না। 'দুই নং' ম্যানেজারের পদ সৃষ্টি করে তাতে আমাকে জড়িয়ে রাখলো। শেষে এমন হলো, কাজ আর অফিস, অফিস আর কাজ ছাড়া আমার কোনো অবকাশই থাকতো

না। মাঝে মাঝে 'সপ্তাহ-শেষে' বোম্বাইয়ের চাকুরেরা যেমন কোথায় বেরিয়ে পড়ে, আমিও দু-একজন সঙ্গী জুটিয়ে বেরিয়ে পড়তাম বটে, কিন্তু কাজের চাপের তুলনায় তাতে আর অবসর বিনোদন হতো কতটুকু? তবু তারই মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যেতো, মুবুর কথা যতটা নয়, ততটা লয়ার কথা। তার চোখের গভীর চাউনি আমি দেখছি ভুলতে পারি নি। ভুলতে পারিনি তার সেই বাঁ চোখের তারার পাশের ছোট্ট তিলটির কথা। অথচ, যখন চালে আসি তখন তার প্রতি আমার ছিল অপরসীম বিতৃষ্ণা। কিন্তু এই এতকাল পরে সেই বিতৃষ্ণাই যেন তৃষ্ণায় পরিণত হয়ে গেল! আরও মাস ছয়েক পরে যখন অফিসে কাজের চাপ একটু কমলো, এবং সেইসঙ্গে ভিক্টোরিয়া থেকেও বারবার তাগিদ আসতে লাগলো, তখন বড়ো-সাহেবকে বাধ্য হয়েই আমার দিকে নজর দিতে হলো! বললেন, কীহে, রওনা হবে নাকি?

ভিক্টোরিয়া?

হ্যাঁ।

আদেশ করুন, নিশ্চয়ই যাবো!

বড়োসাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, বললেন, ভিক্টোরিয়া তো যাবেই, কিন্তু এর আগে কলকাতা ঘুরে এসো।

বললাম, না, তার দরকার নেই।

সে কী! সত্যিই 'হোম-সিক' ফিল করো না?

না।

বড়োসাহেব একটু চুপ করে থেকে সিগারেট ধরালেন, বললেন, ইয়ংম্যান, এবার তুমি বিয়ে করো।

উত্তর দিলাম, স্যর, সেইরকমই একটা ইচ্ছে আছে।

তাই নাকি! বড়োসাহেব বললেন, মনে হচ্ছে, কোথাও জট পাকিয়েছো! এইখানেই নাকি, এই বোম্বাইয়ে?

হেসে ফেললাম, বললাম, না।

তবে ?

ধরুন, ভিক্টোরিয়াতেই ?

অ্যাঁ! সে কী ?

হ্যাঁ, স্যর। সেইজন্যই তাড়া অনুভব করছি। বললেনতো, কালই রওনা হতে পারি।

তিনি বললেন, 'কাল' কোনো জাহাজ নেই, জাহাজ ছাড়ছে সাতদিন পরে। সে জন্য সাতদিন তুমি এখানেই ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দাও। দাঁড়াও, তোমার জাহাজের কেবিন বুক করে রাখি।

বলে, তিনি ফোনে শিপিং অফিসকে ধরে নিজেই সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন। সে-সব কাজ শেষ হয়ে গেলে চা আনালেন। আমার দিকে এক কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, আইসি, ইয়ং ম্যান, কোন মেয়েটি হে ? আমি চিনবো ?

হ্যাঁ। তার নাম লয়া ! আমার বাড়ীতে মুবুর বদলে যে রাধুনীর কাজ করতো, সে।

বড়োসাহেবের আর চায়ের কফি মুখে তোলা হলো না, আমার দিকে অবাক হয়ে খানিক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে কাপটা নামিয়ে রেখে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, কলকাতায়, তোমার বাবাকে জানিয়েছো ? নিয়েছো তার মত ?

এবার গম্ভীর হলাম আমি, বললাম,—আপনি তো জানেন, আমি তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিনি।

একটু হাসলেন সাহেব, বললেন, অভিমান ? সেজন্যই কলকাতায় ঘুরে আসতে চাইলে না ?

বললাম, হয়ত তাই।

বললেন, যাক সে কথা। ওখানে যখন বিয়ে করছো, তখন সেট্‌ল্ হতে চাও ঐখানেই ?

কেন, আপনার আপত্তি আছে ?

একেবারেই না। বরং আমি তো নিশ্চিন্তে থাকবো, ওখানকার অফিস নিয়ে আমাকে আর ভাবতে হবে না।

আস্থা আছে, আমার ওপর ?

বড়োসাহেব বললেন, নিশ্চয়ই।

এতো কথা হলো, 'লয়া'-সম্বন্ধে উনি কিন্তু আর একটি কথাও জানতে চাইলেন না। আমি যথারীতি সাতদিন পরে জাহাজ ধরে চলে এলাম ভিক্টোরিয়ায়।

কিন্তু বছরখানেক পরে এসে খানিকটা অবাক হলাম। কেমন যেন একটা পরিবর্তনের সুর বইছে! গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে বাড়ির সংখ্যাও বেড়েছে। প্রথমেই অফিস ছুঁয়ে আমার এখানকার বড়ো মুরুব্বি কাওয়াসজীর কাছে এলাম। আমি বৃদ্ধ কাওয়াসজীর কথাই বলছি। তিনি দেখা হওয়া মাত্রই বললেন, তোমার অফিস থেকেই খবর পেয়েছিলাম তুমি আসছো! তাই যাকে অস্থায়ীভাবে তোমার বাংলোতে রেখেছিলাম, তাকে উঠিয়ে দিয়েছি, যাও, এই চাবি নাও, ঘরে গিয়ে ঢোকো। মুবুর মতই একটিকে পাওয়া গেছে, কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড, সব কাজ তোমার করে দেবে।

বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু লয়া? কিন্তু কথাটা বলতে পারলাম না। কাওয়াসজী বললেন, তোমার বদলে কাকে অস্থায়ীভাবে তোমার বাংলোতে থাকতে দিয়েছিলাম জানো? তোমার সেই টমাস সাহেব!

একটু অবাক হলাম, বললাম, সে কী ফিরে এসেছে নাকি?

হ্যাঁ, মাস দুই হলো ফিরে এসেছে, কাওয়াসজী বললেন, প্রথমেই তোমার খোঁজ করলো, তুমি দেশে চলে গেছো শুনে হতাশ হলো, বললে, ওয়াণ্ডারফুল ম্যান!

তারপর?

কাওয়াসজী বললেন, কী একটা কাজে এসেছিল, সেটা তার হয়েই গেছে, কিন্তু যেদিন তোমার আসার খবর পেলাম, সেদিন সে আমার সামনে বসে বললে, প্রিন্স আসছে! তাহলে আমি কদিন থেকেই যাই!

বললাম, তাহলে তাকে তাড়ালেন কেন? একসঙ্গে থাকতাম

কদিন!

কাওয়াসজী হাসলেন, বললেন, এখানে রটে গিয়েছিল, তুমি দেশে গিয়ে বিয়ে করেছো, এবারে আসছো বউ নিয়ে! এখনো যে 'কার্তিকটি' আছো, তা বুঝবো কী করে? বিশেষ করে আকাশে-বাতাসে যখন ঐরকম রটনা!

হেসে ফেললাম, বললাম, দিন চাবি। বাড়ি গিয়ে স্থিতু হই, তারপরে আপনার সঙ্গে আবার বসা যাবে।

বাংলোতে আমার আগে আমার নব নিযুক্ত কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ডটি বসে ছিল। তাকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল গলস্থালী। ওব নাম 'বুম্বা'। বেল-অস্থ্রিতেই থাকে। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বেল-অস্থ্রিতেই ঘুরতে গেলাম। ওদের বস্তিতে 'লয়ার' কোনো সংবাদ পেলাম না, ঘুরে ঘুবে দেখলাম, পুরানো মুখ একটিও চোখে পড়লো না। বেরুবার আগে বুম্বাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লয়াকে চিনিস?

সে চিনতে পারলো না বেল-অস্থ্রিতে ঘুবতে ঘুরতে সেই পাথর-ফাটানো পাহাড়টায় এসে হাজির। কাছেই একটা নতুন মজমুর-বস্তি হয়েছে। তাদের মধ্যেকার একটি বুড়ো লোককে জিজ্ঞাসা করে খোঁজ পেলাম, সেই পাগলা-সাহেব পাহাড় ফাটিয়ে কিছুই পায়নি, সর্বস্ব খুইয়ে মাস ছয়েক আঁগে দেশে ফিরে গেছে, আর আসেনি। ফাটানো পাহাড়টার গর্ত গুলো নিশ্চুপ পড়ে আছে, কেউ ওখানে যায় না, পাথর ফাটানোর আর কোনো আওয়াজ শোনা যায় না। চকিতে 'মেরীর' কথা মনে পড়লো, তারপরে ধীর পায়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে এলাম বাংলোয়, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলির সামনের গোল টেবিলটায় হারিকেন জ্বলছে। তারই স্বল্প আলোয় দেখা যাচ্ছে টমাসের মুখ, কেমন যেন ভেঙে-পড়া চেহারা, সারা শরীর জুড়ে যেন অস্বাভাবিক অবসন্নতা! অন্ততঃ প্রথম দর্শনেই তাই মনে হয়েছিল। সে আমাকে দেখে দাঁড়ালো, অভিবাদন-বিনিময়ের পর সে বললে, ছুঘণ্টা ঠায় বসে আছি। অনেক কথা আছে, প্রিন্স, বসুন।

মনে নেই ওকে 'আপনি না তুমি' করে কথা বলতাম। কিন্তু 'প্রিন্স' বলে সৌজন্য দেখিয়ে ও যখন 'বসুন' বললো, তখন আমাকেও 'আপনি' সম্বোধন বজায় রাখতে হলো। বললাম, প্রথমে বলুন, এখান থেকে গিয়ে উঠেছেন কোথায়? যখন এখানে ছিলেন তখন এখানেই ফিরে আসুন, কেমন?

টমাস হাসলেন, বললেন, দু দিনের জন্য আর কেন? নতুন প্লেন সার্ভিস চালু হয়েছে জানেন তো? সপ্তাহে একদিন। এখন আর ভায়া 'পোর্তো লুই' বা 'টেনানারিও' হয়ে যেতে হবেনা, একেবারে আফ্রিকার বুকের ওপর দিয়ে ঘানায় গিয়ে পৌঁছতে পারবো। প্লেনেও সিট পাওয়া গেছে। অর্থাৎ পরশুই রওনা দিচ্ছি। আগের সপ্তাহেই যেতে পারতাম, কিন্তু আপনি আসবেন খবরটা পেয়ে রয়ে গেলাম। কিন্তু সে যাই হোক, আপনি মশাই অবাক করে দিয়েছেন আমাকে; শুনেছিলাম, বিয়ে করেছেন, বউ নিয়ে আসবেন। তাইতো চট্‌পট বাংলোটা ছেড়ে চলে গেলাম! নইলে যেতাম নাকি?

বলে, হাসতে লাগলেন মিঃ টমাস। উত্তরে একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, না, বিয়ে করিনি বটে, কিন্তু বিয়ে করতে এসেছি। বিয়ে করে এখানেই 'সেটল্' করবো, আর কোথাও যাবো না, হেড-অফিসকেও তা জানিয়ে দিয়ে এসেছি!

বাঃ! সে তো বেশ কথা!

কিন্তু আপনি যে চলে যাবেন!

টমাস হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরলেন, তারপরে বললেন, সে না হয় 'বুকিং ক্যানসেল করে দেবো। এখন বলুন কবে করছেন বিয়েটা! এ বিয়ের ভোজ না খেয়ে আমি নড়ছি না!

বললাম, এসেই কনের সন্ধান করলাম। দেখছি, কনেই উধাও!

মানে!

বললাম, তবে, শুনুন মিঃ টমাস, এখানে সবাই আমাকে প্রিন্স বলে, দেখেছেন তো? দেখাদেখি আপনিও ডাকতে আরম্ভ করেছেন।

সুতরাং আমি যদি কোনো 'প্রিন্সেস' কে বিয়ে করি, তাহলে কেমন হয় ?

খুব ভালো হয় !

বললাম, নিন, সিগারেটটা ধরান। আজ রাতের খাওয়াটা এখানেই সারতে হবে। শুধু তাই নয় বেশি রাত হয়ে গেলে এখানেই শুয়ে থাকবেন। কেমন ?

ঠিক আছে ! টমাস -বললেন, কিন্তু এবার পরিচয় দিন প্রিন্সেসের ?

বললাম, তাকে আপনি ভালোভাবেই চেনেন। আপনাদের রাজা প্রেম্পের মেয়ে, লয়া।

টমাস এতো অবাক হলো যে, মুখ থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন হাঁ করে। তারপরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, মাপ করবেন প্রিন্স, আমি সেই ব্যাপারেই ঘানা থেকে আবার এখানে এসেছিলাম। সেবার আমার মারাত্মক ভুল হয়েছিল বলে দুঃখিত। সেটা শোধরাতে এবং আরও ব্যাপারটা ভালোকরে বুঝে নিতে আমি এসেছিলাম। আমি ঘানা থেকে রাজা প্রেমপের একটা গ্রুপ ফটোও এনেছি। এই দেখুন। বলে ওঁর পকেট থেকে বার করলেন একটি খাম। ছবিটা এই ভিক্টোরিয়াতেই তোলা। একটি ছোট মেয়ে আছে ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে, রাজা, রাণী বা পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে। মেয়েটির পাশে একটি ক্রিয়োল মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে। টমাস বললেন, এই ক্রিয়োল মেয়েটিই হচ্ছে রাজা প্রেমপের তথাকথিত স্ত্রী। আর এই তার মেয়ে। ঘটনাচক্রে জানাগিয়েছিল, এরও নাম লয়া। এই লয়া এখন অনেক বড়ো হয়েছে, অথচ আমাদের নতুন রাষ্ট্র 'ঘানার' কথা সে শোনেনি। আছে এই ভিক্টোরিয়াতেই। রীতিমত শিক্ষিতা। এই ভিক্টোরিয়াতেই সে মেয়েদের কনভেণ্টে শিক্ষিকার কাজ করছে। যদি বিয়ে করতে হয় প্রিন্স, তাহলে এই মেয়েকেই আপনি বিয়ে করুন। কাল সকালেই চলুন আমার সঙ্গে। আপনার

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

আমি কিছু বললাম না। আমার ভিতরটা কেমন যেন হঠাৎ নিথর হয়ে গিয়েছিল। শোকও নয়, দুঃখও নয়, কোনো আবেগের ঢেউই সেখানে ওঠেনি। আর সেজন্য আমি নিজেকে দেখে এতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছিল না। টমাস এই নতুন লয়াকে কী করে আবিষ্কার করলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, ফটো থেকে চিনতে কোনো কষ্ট হয় না, এই মুখ বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি। ক্রিয়োল মায়ের মতো ফর্সা রঙই পেয়েছে মেয়ে, ভারী নম্র লাজুক স্বভাবের মিষ্টি মেয়ে। আপনি বিয়ে করুন আপনাদের দুজনকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানিয়ে ঘানায় নিয়ে যাবো। আপনি যদি ঘানায় 'সট্‌ল্‌' করেন, রাজকীয় হালে থাকবেন। রাজা প্রেমপের জামাই হবেন আপনি, একী কম কথা? ঘানার লোকেরা বিশেষ করে আশান্তি সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাকে লুফে নেবে!

আমি এসব কথার কোনো উত্তর দেইনি। খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে দু-খাটে শুয়েছি পাশাপাশি, টমাস নিজের আবেগে সমানে কথা বলে যাচ্ছিলেন। তার মধ্যে নতুন লয়ার প্রসঙ্গই বেশি। পুরানো লয়ার কথা একবারও উঠলো না, আমিও জিজ্ঞাসা করলাম না। পরদিন সকালে উঠে ওঁর সঙ্গে গেলাম ভিক্টোরিয়ায়। গেলাম সেই কনভেণ্টে। টমাসের চেষ্টায় মাদার সুপিরিয়রের অনুমতি মেলবার পর মেয়েটি বাইরের সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ঘরে এলো। চেহারায় একটা আলগা চটক আছে, সাদা ফ্রকটি সুন্দর মানিয়ে গেছে দেহলতিকার সঙ্গে। টমাস প্রগলভতা করে বিয়ে-টিয়ের কথা তখন তুললেন না। তুললে আমি খুবই লজ্জায় পড়তাম। শুধু বললেন, ইনিও একজন প্রিন্স, আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে।

বেশ তো!

বললাম, খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। কবে যাবেন ঘানায়?

মেয়েটি ইতস্ততঃ করে বললে, মনস্থির করি নি। বলতে পারছি না।

টমাস বলে উঠলেন, না না, তা হয় না প্রিন্সেস লয়া, আপনার দেশ আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আপনাকে যেতেই হবে। তবে, অভ্যর্থনার আয়োজন-টায়োজন আছে তো ? সেটা শেষ করেই আমরা আপনাকে জানাবো. তবে মহাসমারোহে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে। হয়ত আমি নিজেই আসবো অভ্যর্থনাকারী দলের সঙ্গে।

মেয়েটি হাসলো, কিছু বললো না। আমরা কথাবার্তা বলে একটু পরেই চলে এলাম। টমাসকে নিয়ে আবার আমার বাংলোয় ফিরে এলাম। বললাম, এখানেই থাকুন। আমি অফিসটা সেরে আসি।

বলা বাহুল্য, অফিসের কাজে সেদিন মন দিতে পারলাম না। বেলা তিনটে নাগাদ ফিরে এলাম বাড়িতে। টমাস কাল সকালে প্লেন ধরবেন তাই আজ রাত্রে থাকতে পারবেন না, রাতের খাওয়া খেয়েই উনি ওঁর হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন কথা হলো। ওঁর হোটেলটা ভিক্টোরিয়ায় আর বিমান বন্দর থেকে খুব দূরে নয়। গল্প করতে করতে একসময় বললেন, প্রায়ই দেখা করবেন কিন্তু আমাদের প্রিন্সেসের সঙ্গে। ঘানায় যেন দুজনকে একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, বুঝলেন ?

খুব খুশি হবেন সেটা হলে ?

টমাস বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই। নইলে এতোকরে বলছি কেন ?

হুঁ ! বলে আমি যথারীতি চুপ করে গেলাম।

টমাস 'মৌনতা সম্মতিলক্ষণম' ধরে নিয়ে নিজের আবেগে বাক্যালাপ করে যেতে লাগলেন। খাওয়ার সময়ও তাতে ছেদ পড়লো না,। গাড়ির ব্যবস্থা আগেই করে রাখা ছিল, গাড়ি আসতেই তাতে করে উনি চলে গেলেন। আমি যেন হঠাৎ একা পড়ে গেলাম ! এতক্ষণ ওঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, উনি চলে যেতেই সে নেশাটা কেটে গেল। শুয়ে শুয়ে

নানান কথা ভাবতে লাগলাম, সহজে ঘুম এলো না।

পরদিন সকালে উঠে গেলাম কাওয়াসজীর কাছে। বৃদ্ধ কাওয়াসজীকে বললাম, অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম বলে মাপ করবেন।

উনি একটু হেসে বললেন, আদৌ অসময় নয়, অত্যন্ত সুসময়। এসো দুজনে মিলে বসে চায়ের কাপে তুফান তুলি।

একটু পরেই চা এলো। চুমুক দিতে দিতে বললাম, টমাস আপনাকে বলেছে ওর ভুলের কথা?

ভুল!

হ্যাঁ, লয়ার ব্যাপারে।

কাওয়াসজী বললেন, ও, বুঝেছি। হ্যাঁ, বলেছে। এতো সাধারণ কথা! মানুষের ভুল তো হতেই পারে! ওরও ভুল হয়েছিল!

কিন্তু মারাত্মক ভুল, বললাম, মিঃ কাওয়াসজী, আসল লয়া এখন কোথায় বলতে পারেন?

কাওয়াসজীর মুখখানা এতক্ষণে গম্ভীর দেখালো, বললেন, কথাটা শুনে মেয়েটা খুব ধাক্কা পেয়েছিল। সত্যি বলতে কী, ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেমন করে যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতো, কথা বললে শুনতে পেতো না। সবসময় মনে হতো, কী যেন ভাবছে, গভীরভাবে ভাবছে! অবশ্য, সামলে উঠতেও বেশি সময় নেয় নি।

এখন ও কোথায়?

উনি বললেন, সায়া-দি-মালটা ব্যাঙ্কে, যেখানে ডুবুরীরা মুক্তো তুলতে যায়, তার কাছে 'বার্ডস আইল্যাণ্ড' না কী যেন নামের একটা ছোট দ্বীপ আছে সেখানে নতুন খামারের কাজ করার জন্য একদল স্ত্রী পুরুষ কুলি নিয়ে গেছে দ্বীপের ইজারাদার, সেই দলে নাম লিখিয়ে দ্বীপে চলে গেছে লয়া।

বললাম, আচ্ছা, এই সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন করি। কথাটা টমাসকে জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি হয়ত

জানতে পারেন।

কী কথা বলো তো ?

বললাম, লয়ার ব্যাপারে টমাসের না হয় ভুল হয়েছিল, 'মুবু'র ব্যাপারে হয়নিতো ?

না, কাওয়াসজী বললেন, টমাস আমাকে সব বলে গেছে। মুবু ক্রীতদাসেরই ছেলে।

আমাদের লয়া তা জানে ?

নিশ্চয়ই। এটা জানার পরই তো সে কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখতে গিয়েছিলাম ওকে ওদেব বস্তিতে। দেখে বড়ো কষ্টও হয়েছিল।

বললাম, অনেক ধন্যবাদ। আমি যাবো মিঃ কাওযাসজী।

কোথায় ?

বললাম, বার্ডস আইল্যাণ্ডে. লযাব কাছে।

কিন্তু লয়ার কাছে বার্ডস আইল্যাণ্ডে যাওয়া কি অতই সহজ ? শুনলাম, সাধারণতঃ লঞ্চে যায় ডাক, লোকজন আর দরকারি খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে মাসে একবার করে মাত্র। সে জন্য আমার ওখানে গিয়ে পৌঁছতে একমাস লেগে গেল। যাবার আগে ওখানকার ইজারা-দারের যে অফিস আছে ভিক্টোরিয়ায় (দেখা গেল, আমাদের অফিসের পাশেই ওদের অফিস আমাদের অফিস বা আমি, ওদের খুবই চেনা), তাদের কাছ থেকে আমার পরিচয়পত্রসহ দ্বীপে যাবার হুকুমনামা নিয়ে যেতে হয়েছিল। সেটা দেখে ওদের ম্যানেজার আমাকে খানিকটা খাতির করলেন। যদিও 'কালো চামড়া'দের খাতির করার লোক তারা নন। খুঁজেপেতে, জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন লয়ার কাছে পৌঁছলাম, তখন ক্ষেতে মজুরেরা কাজ করছিল। একা নয়, অনেকের সঙ্গেই কাজ করছিল সে। ওদের কাছেই শঙ্কর মাছের চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে মজুরদের সর্দার, এ লোক সাদা চামড়ার

নয়, কালো চামড়ারই বটে, কিন্তু বীভৎস চেহারা। আমার সঙ্গে ইয়োরোপীয় ম্যানেজারটির জনৈক সহকারী ছিল। তার মাধ্যমে সর্দারটির সঙ্গে কথা বলে লয়াকে ছুটি করিয়ে আনতে পারলাম। চলে আসছি ওকে নিয়ে, এমন সময় সহকারীটি আমাকে ডাকল, বললে, সর্দার জিজ্ঞাসা করছে, তুমি কি ওকে ভিক্টোরিয়ায় নিয়ে যাবে ?

বললাম, ও রাজী হলে ওকে ভিক্টোরিয়ায় কেন, আমার দেশ ভারতবর্ষে নিয়ে যাবো। সহকারীর মাধ্যমে কথাটা বুঝে সর্দার প্রায় ক্ষেপে উঠলো বলা যায়, বললে, কী করে তা সম্ভব ? সহকারীর মারফতে বুঝিয়ে বললাম, এতো আর ক্রীতদাসী নয় যে, নেওয়া সম্ভব হবে না ? এ হচ্ছে বিংশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী নয়।

সর্দার তখনো তড়পাচ্ছে, বললে, নাই বা হলো ক্রীতদাসী, ঠিকা-প্রথা-বদ্ধ শ্রমিক তো ? যখন তখন বললেই অমনি নিয়ে যাওয়া যায় ?

বললাম, সে সব কথা আমার হবে ইয়োরোপীয়ান ম্যানেজারের সঙ্গে। আমি চুক্তির পুরো টাকা দিয়ে দেবো, অবশ্য যদি ও রাজী হয়।

সর্দার আর কিছু বললো না। নিজের মনে গজগজ করছিল। আমার কথাগুলো সবই শুনছিল লয়া, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না। মাত্র কয়েকদিন। কয়েকদিনে একটা মানুষের চেহারা যে এমন হয়ে যেতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেন শরীর থেকে সব সুষমা সব লাবণ্য কেউ শুষে নিয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন শূন্যতা। আমি চললাম, আর অমনি যন্ত্রের মতো আমার সঙ্গে চলতে লাগলো। চলতে চলতে একসময় বললাম, তোমার ঘর কোথায় ? কোথায় থাকো তুমি ?

কোনো কথা না বলে আঙুল তুলে দেখালো সমুদ্রের দিকে।

নিশ্চুপে চলতে লাগলাম পাশাপাশি। সমুদ্রের জল কিছুটা ভিতরে ঢুকে এসেছে। তার কিনারে নারকেল পাতা কাঠ আর

ভাঙা টিনের সমাবেশে যা তৈরি হয়েছে, তা ঘর নয়, ঘরের প্রহসন। বললাম, এখানেই তুমি থাকো ?

মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

তখন বিকেল হয়ে গিয়ে সমুদ্রের জল হয়ে উঠেছে গাঢ় নীল। ঘর ছাড়িয়ে একেবারে জলের কাছাকাছি গিয়ে বসলাম দুজনে। ওর পরনে ঢিলে একটা সেমিজ, চেহারা ম্লান, মলিন, শুধু সেই তিলটি না দেখতে পেলে বোধহয় চিনতেই পারতাম না যে, ও-ই সেই লয়া !

কতো কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য, বলা হলো না কিছুই। বিকেল মিলিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এলো রাত, চাঁদ উঠলো দিগন্তে সোনার কলসের মতো, তারপরে জ্যোৎস্নার সুধা বিকীরণ করতে করতে এক সময় ঢেকে গেল মেঘে। তখনো আমরা দুজনে বসে আছি চুপচাপ, পাশাপাশি, কেউ কোনো কথা বলছি না।

কিন্তু পুরুষকে নাকি বলা হয় মেয়েদের তুলনায় অস্থির প্রকৃতির, তাই নীরবতা ভাঙলাম আমিই প্রথম। বললাম, মুবুর দেওয়া সেই মুক্তোটা আছে ?

মাথা নেড়ে নীরবেই জানালো, হ্যাঁ।

বললাম, তোমার সর্দার বা অন্য কেউ টের পায় নি তো ? পেলে তৎক্ষণাৎ কেড়ে নেবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকালো আমার দিকে, চোখদুটো যেন প্রখর হয়ে উঠলো মুহূর্তে। বললো, নিক দেখি কেড়ে ?

আরও অনেক কিছু জানবার ছিল আমার। কিন্তু মনে হলো, আর বেশি কী জানবো ? ওর এই বিধ্বস্ত শরীর। এই স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন। এই চাবুক-খাওয়া মজুরাণীর কাজ, এর মধ্য দিয়েই কি আমি পাইনি উত্তর আমার প্রশ্নাবলীর ? তবু মন মানে না, বলে উঠলাম, আমি কেন এসেছি জানো ?

মুখের দিকে তাকালো। ম্লান জ্যোছনায় তবু দেখতে পেলাম তার চোখের চাউনি। সে চোখে ফুটে উঠলো শুধু বিস্ময়, আর কিছু নয়।

আমি খপ করে ওর হাতখানা ধরে ফেললাম, তোমায় নিয়ে যেতে। কোথা থেকে এসেছি জানো? সুদূর আমার সেই দেশ থেকে। আর এসেছি শুধু তোমারই জন্য।

সংকল্প নিয়েই এসেছি। তুমি কী ছিলে, আর কী নও, সে আমার দরকার নেই। আমি তোমাকে বিয়েই করবো। ভিক্টো-রিয়াতেই থাকবো সারাজীবন। শুধু তোমার জন্য লয়া, তোমাব জন্য।

কিন্তু কার কাছে বললাম কথাগুলো? একটা কাঠের পুতুলের কাছে? নিস্পন্দ নির্বাক একটি মানুষ, মুখের ভাবে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই, চোখে নেই কোনো ভাবসঞ্চারের ঢেউ। আস্তে আস্তে আমার হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলো, কোনো উত্তর দিলো না। আমি একটু থেমে থেকে তারপরে বললাম, একটা কথা হয়ত তুমি বলবে, তুমি রাজার মেয়ে নও। না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এই একটি বছর বোম্বাইতে বসে দিনরাত কেন যে তোমার কথা ক্রমাগত ভেবেছি, তার কারণটা আমি নিজেই ভালো করে বুঝি-নি। কিন্তু এখানের মাটিতে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি, আমার জীবন-পথে তোমাকে আমার চাই-ই চাই! আমার এতো কথার পরও ও নিস্পন্দ-নির্বাক। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার বলে উঠলাম, তুমি যে রাজার মেয়ে নও, তা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো?

চাঁদের আবছা আলোয় ওর মুখে এই সময় এক অদ্ভুত প্রশান্তি লক্ষ্য করলাম। বলে উঠলো, রাজা প্রেমপের মেয়ে আমি নই, তা আমি জেনেছি।

বললাম, আর আমি সেটা জেনেও তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য পাগলের মতো ছুটে এসেছি!

আমার মুখের দিকে ফেরালো ওর মুখ। ধীরে ধীরে বললো, জানি, কিন্তু তবু কী মনে হয় জানো? বললে বিশ্বাস করবে?

কী?

লয়া বললে, আমি সত্যিই রাজকন্যা। প্রথম প্রথম বড়ো যন্ত্রণা হতো, পিঠে চাবুকের ঘা শুকোতো না।। ব্যথায় ছটফট করতাম সারারাত। আজকাল করি না। ওরা যখন মারে, তখন মনে-মনে হাসি, ভাবি, কার শরীরে ওরা আঘাত করছে? এ-তো আমার শরীর নয়!

'চাবুকের আঘাত'-এর কথায় মুহূর্তে যেন জ্বলে উঠলাম, এখনো এই অত্যাচার চলছে! এতো আইন-টাইন হওয়া সত্বেও? চাবুক আমি সর্দারের হাতে দেখেছিলাম বটে, ভেবেছিলাম ও বুঝি শুধু ভয় দেখাবার জন্য। না লয়া, থাকতে হবে না তোমার এই জঘন্য দ্বীপের নির্বাসনে। তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চলো।

ফিরে যাওয়ার কথায় মুহূর্তে যেন শিউরে উঠলো আতঙ্কে। বললো, এই স্বর্গ থেকে কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে তুমি? ঐ দেখ চেয়ে 'সায়া-দি-মালটা-ব্যাঙ্ক'! ওখান থেকেই তো মুক্তো তুলেছিল আমার রাজকুমার। আমি জানিনা ভেবেছো? সব আমি জেনেছি! নিজের প্রাণ বলি দিয়েই আমার রাজকুমার তার রাজকন্যার জন্য মুক্তো তুলে নিয়ে এসেছিল! দেখ না কেমন ঢেউ উঠেছে ওখানে! পর পর তিনটি ঢেউ। চাঁদের আলো পড়ে হীরের মতো ঝিকমিক করছে! জগতে এমন কী থাকতে পারে যা ওর থেকে দামী? কতো ঝিনুক আছে ওখানে। কতো মণি-মাণিক। মনে হয় সব যেন আমার। আমার জন্য সব সে ওখানে সাজিয়ে রেখে গেছে! সবই যেন আমার, আর কারুর নয়! আমি সত্যিই রাজকন্যা। আমি সত্যিই রাজকন্যা!

কী যে অদ্ভুত প্রশান্তি আর অপার্থিব আনন্দের স্পর্শ দেখেছিলাম ওর ঐ চোখে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।

ইয়োরোপীয়ান ম্যানেজারটি সব শুনে বললে, আশ্চর্য? মেয়েটা

যেতে চাইলো না তোমার সঙ্গে? আমাদের দিক থেকে কোনো আপত্তি ছিল না, শুধু চুক্তির অর্থটা—

সে সব আমি দিয়ে দিলাম তোমাদের হেড অফিসে। বললাম, মনে রাখবে, আমি ছুটে এসেছিলাম সুদূর ভারতবর্ষ থেকে। আর সেটা ওরই জন্য।

ম্যানেজার বললে, নিয়ে যাও ওকে, জোর করে নিয়ে যাও। আমরা 'হেলপ' করবো!

বললাম, কিন্তু কাকে নিয়ে যাবো? আমি ভেবেছিলাম আমিই বুঝি ঐ প্রতিমার ভিতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি! না, না, আমি করি নি, আমি সেই প্রিন্স নই, সে প্রিন্স আর একজন! যার ছোঁয়ায় ওর ভিতরকার রাজকন্যা সত্যিই জেগে উঠেছে! তাকে ছোঁয়ার সাধ্য আমার নেই! আমি চললাম। তোমাদের লঞ্চ ছাড়ছে, আর দেরি করা যাবে না!

বলা বাহুল্য আমি একাই ফিরে এসেছিলাম। ফিরে এসেছিলাম ভিকটোরিয়ায়, তারপরে জাহাজ ধরে আবার সেই কোচিন-বন্দরে, সেখান থেকে বোম্বাই। কিন্তু যে ছেলে ছিটকে দূরে চলে গিয়েছিল, ঠিক সেই ছেলেই ফিরে এসেছে কী?

আমি অন্য মানুষ। দুটি মানুষের স্মৃতি বুকে নিয়ে জীবনের পথে হাঁটছি। ভারমুক্ত কবে যে হবো, তা জানি না। না হলেও ক্ষতি নেই। এ তো এক অদৃশ্য মুক্তো, স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়লে তবেই—যে মুক্তো নিটোল অশ্রুবিন্দুর মতো ফুটে ওঠে।